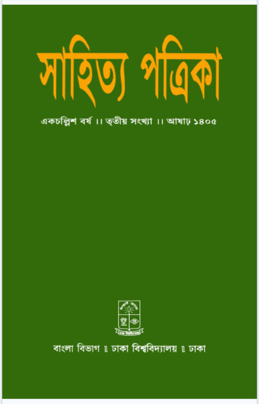

Vol. 41 | No. 3 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক (১৯৪৭-১৯৭১)

Volume	41
Issue	3
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	দিলারা হাফিজ
Published online	June 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i3.2
Pages	36-94
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক

(১৯৪৭-১৯৭১)

দিলারা হাফিজ*

আধুনিক কবিতা জটিল যুগেরই প্রতিবিম্ব। সমকালই আধুনিক কবিতার জনক। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটা প্রচণ্ড ভাঙা-গড়ার যুগ। এই সময়কালে রাষ্ট্র, সমাজ ও তার অর্থনৈতিক ভিত্তি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। এ সময়ের মধ্যে ঘটেছিল দু'দু'টো মহাযুদ্ধ, ঘটেছিল একাধিক বিপ্লব। পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও তুলনামূলক নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে নানা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটেছিল। তার ফলে মানুষের জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে প্রাক্তন ধারণা ও বিশ্বাস ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। যদিও এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপে, তার আকৃতি এবং প্রকৃতি প্রথমে খুব স্পষ্ট ছিল না এবং বাঙলা সাহিত্যে তার ঢেউ পৌঁছেছিল আট দশ বছর পরে, তবু আধুনিক বাঙালি কবির চিন্তাধারার গঙ্গোত্রী সেইখানে।[১] তাই আধুনিক বাংলা কবিতার পটভূমিকা বিস্তৃত হয়ে আছে দুই মহাদেশে। বিপর্যস্ত মুল্যবোধেই আধুনিক কবিতার জন্ম। আধুনিক যুগের সংঘাতমুখর পরিস্থিতি পৃথিবীজোড়া অর্থনৈতিক সংকট, চিরন্তন মূল্যবোধের, বিশ্বাসের জগতের দ্রুত অবলুপ্তি কবিতাকে নিয়ে এসেছিল আধুনিক বোধের কাছাকাছি।

এই সঙ্গে এলো পাশ্চাত্য কাব্য-আন্দোলনের ব্যাপক ঢেউ। বিশেষ করে টি. এস. এলিয়ট এবং তার 'ওয়েষ্টল্যাণ্ড' বা 'পোড়োজমি' বাংলা কবিতাকে এক তীব্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, তার নৈরাশ্য ও নিরাসক্তি 'ফাঁপা মানুষে'র চিত্রকল্পে প্রকাশিত হলো। এলিয়ট নতুন বিশ্বাসের সঞ্জীবনী ধারায় পূর্ণতর মানবতাকে পুনরুজ্জীবিত করবার আশা নিয়ে 'পোড়োজমি'তে প্রবেশ করেছিলেন। তবে এলিয়টের রচনাবলি আমাদের দেশে ১৯৩০-এর পূর্বে তেমন সাড়া জাগায়নি। বুদ্ধদেব বসুর মতে, "লরেন্সী উন্মাদনার অবসানে পাউণ্ড আর

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ.১১

এলিয়ট একই সঙ্গে বাঙলাদেশে পৌছল।" বিষ্ণু দের ভাষায় : "এই য়ুরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হলো দেরিতে, বলা যায়, প্রায় টি.এস. এলিয়টের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়।"

আমাদের আধুনিক কবিরা কাব্যরচনার প্রাক্কালে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যুগন্ধর প্রতিভা, অথচ অনুভব করেছিলেন তাঁদের যুগসমস্যার সঙ্গে মহাকবির কাব্যস্বভাবের পার্থক্য। তাঁরা বুঝেছিলেন ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অফুরন্ত আকর থেকে আহরণ না করলে নতুন নির্মিতি সম্ভব হবে না। এলিয়টী দীক্ষার প্রাক্কালে সুধীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন : "বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।" জীবনানন্দের মতে, "আধুনিক বাঙালি কবিরা কিছুটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমার জন্য এলিয়ট, পাউন্ড প্রমুখের পন্থা নিলেন। অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা বিশিষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভের্লেন, চসার বা ইয়েটস ও এলিয়টের সদর্থক বা নঞর্থক মননবৈচিত্র্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।" কিন্তু একসময় এলিয়টের উপর থেকে আস্থা সরে গেল। এসময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আধুনিক কবিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। বিষ্ণু দে অডেন–স্পেন্ডারের খেয়ালি সাম্যবাদী আস্থা হারিয়ে এলুয়ার ও আরাগঁর কাব্যে আশ্রয় খুঁজেছেন। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে আসতে চেয়েছেন। জীবনানন্দ আত্মপরিক্রমা ছেড়ে ক্রমশ সমাজসচেতন হয়ে উঠছেন, তাঁর ছোট নীড় থেকে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন 'মহাপৃথিবী'র বুকে, 'সাতটি তারার তিমিরে' সন্ধান করেছেন ভোরের আলো। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে এসেছে বেদনার স্পৃহা, সুধীন্দ্রনাথে অস্তিত্ববাদী প্রভাব।

আধুনিক কবিতার এই পটভূমিতে আবু সয়ীদ আইয়ুব আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, এভাবে, "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্ততঃ মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"[২]

ক. কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ – পরবর্তী।

---

২ আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক বাঙলা কবিতা,* ভূমিকা, পৃ. ১১০

খ. ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্তি প্রয়াসী।

গ. সৃষ্টির দিক থেকে তা নবতম সুরের সাধক।

আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তুগত ও প্রকরণগত এইসব লক্ষণ কোনো একজন বিশেষ কবির মধ্যে প্রকাশ পায়নি। তবে উভয় লক্ষণগুলির অধিকাংশ যেসকল আধুনিক কবির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীই প্রধান। এই পাঁচজন কবি জীবনানুভূতির সীমা বিস্তৃত করেছেন ও মার্জিত করেছেন নতুন ছন্দ ও চিত্রকল্পের উদ্ভাবনে। আধুনিক কাব্যসৃষ্টি আন্দোলনের এঁরাই ছিলেন পুরোধা। এঁরাই প্রথম নির্দেশ করেন রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় প্রতিভাদীপ্ত কর্মের পথে আধুনিক কবিতার মুক্তি অসম্ভব, কারণ আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এঁদের কাব্যসাধনা শুরু হয়েছিল এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আজও তার শেষ হয়নি। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের শেষ দিন পর্যন্ত এই স্বেচ্ছাগৃহীত সৃষ্টির ব্রত পালন করে গিয়েছেন। আধুনিক কাব্যে পূর্বোল্লেখিত প্রধান লক্ষণগুলি এদের কাব্যে সর্বাধিক এবং সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে দৃষ্ট হয় বলে পরবর্তী প্রজন্মের কবিরাও এই লক্ষণসমূহ আত্মস্থ করেই তিরিশোত্তর কবিতার ধারাকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন আজো।

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার কবিতায় বিষয়-বৈচিত্র্য এবং প্রকরণ-শৈলীতে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে। দেশ-বিভাগের পর প্রথম দশ বছর পূর্ব বাংলার কবিতার ঐতিহ্য ও ভাষা ছিলো কবিদের কাছে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। "নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ পূর্ব বাঙলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ কী হবে তার রাজনৈতিক ইঙ্গিত ভাষা-আন্দোলনের ঘটনাতেই মেলে, কিন্তু তবু প্রশ্ন ছিলো—পূর্ব বাঙলার কবিতা কি বাঙলা কাব্যের মূল ঐতিহ্যের সঙ্গে লগ্ন, নাকি মধ্যযুগে মুসলমান-রচিত দোভাষী পুথির পুনরুজ্জীবন ঘটবে এই বাঙলার কবিতায়? এই মতবিরোধের শৈল্পিক প্রতিফলন যেন ফররুখ আহমদ-আহসান হাবীব কিংবা তালিম হোসেন-আবুল হোসেনের কবিতা। এরা সবাই চল্লিশের দশকের কবি। বিভাগপূর্ব বাঙলাদেশে কলকাতা-জীবনেই এঁদের কাব্য সাধনার শুরু। কিন্তু পাকিস্তান-আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রভাবে ফররুখ-তালিমের কবিতা গোড়া থেকেই আহসান হাবীব-আবুল হোসেনের ধারা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। সেই পার্থক্য প্রথমত প্রেরণাগত, দ্বিতীয়ত

প্রকাশগত।"[৩] ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উদ্বেল ফররুখ আহমদ মূলত তিরিশের ঐতিহ্য-সংলগ্ন হয়েও কাব্যবিশ্বাসে অচিরেই স্বাতন্ত্র্যবাদ অঙ্গীকার করেছেন। তাঁর প্রিয় কবি কোলরিজের নাবিক ফররুখের কবিতায় নতুন ভূমিকায় ফিরে এসেছে। আরব্য-উপন্যাসের সিন্দাবাদের মতো সে এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী। নতুন দেশের সন্ধানে তার যাত্রা। পক্ষান্তরে আহসান হাবীব ও আবুল হোসেন আবহমান বাংলা কবিতার যে-ধারাটি তিরিশের শক্তিমান কবিদের হাতে সমৃদ্ধ হয়েছিলো, তারই উত্তর-সাধক। সৈয়দ আলী আহসান আবার ইসলামি মনোভঙ্গির পরিবর্তে পাশ্চাত্য কাব্যবোধে হয়ে উঠেছিলেন আধুনিক। অচিরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পাশ্চাত্য-শিল্পভাবনা ও আঙ্গিকের দ্বারা কবিতাকে বিজড়িত করে নিতে না পারলে আধুনিকতায় উত্তরণ সম্ভব নয়। প্রকৃত বিবেচনায় আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় চল্লিশের কবি আহসান হাবীব, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের কবিতায় আধুনিকতার সূচনা হয়েছে তাঁদেরই হাতে। পঞ্চাশের দশকে অর্থাৎ এই পর্বে সৈয়দ আলী আহসান ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছেন পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আধুনিক। অন্যদিকে আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, সানাউল হক একই বোধে উজ্জীবিত হয়ে কবিতা রচনায় গ্রহণ করেছেন মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। আবহমান বাংলা কবিতা এবং তিরিশের ও চল্লিশের আধুনিকতার ঐতিহ্য গ্রহণ করেই কাব্যচর্চায় সক্রিয় থাকতে চেয়েছেন তাঁরা।

কবিতার শরীরে সঙ্কেত ও প্রতীকের যে লীলা তা কখনোই দুর্বিশ্লেষ্য নয়। এইসব আপাত জটিলতার নেপথ্যে কবিতার মর্মে কাজ করে সমাজ, দেশ, কাল। একজন নজরুল ইসলাম কেন রাবীন্দ্রিক মুল্যবোধে অনুপ্রাণিত হতে পারেন না—তার উত্তর মেলে উভয়ের কালিক ও সামাজিক ব্যবধানের ভেতরে। গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, অথবা আবদুল কাদিরের কবিতায় একই কারণে তিরিশোত্তর কবিতার স্বভাব অনুপস্থিত। এমনকি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও পূর্ব বাংলার কবিতায় এদের পক্ষে মৌলিক ধারার উদ্বোধন কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেই দায়িত্ব যাদের উপর বর্তায় তাঁরা বয়সে তরুণ এবং শিল্প-সাধনায় নবীন একদল কবি। নতুন কবিতা এদেরই অবদান। রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ-আবেগ, জীবনের অভিব্যক্তি এই নতুন কবিতা। নতুন কবিদের নাম জিল্লুর রহমান

৩. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, *কথা ও কবিতা*, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮১, পৃ. ১৩৮

সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। লক্ষণীয় যে, এই আগন্তুক কবিকুল যেমন সমকালীন প্রধান কবি ফররুখ আহমদের আদর্শ থেকে দূরে তেমনি তিরিশের নাগরিক বিষাদ ও একাকিত্ব থেকেও বিচ্ছিন্ন। কেবল শামসুর রাহমানের বাকভঙ্গিতে ছিলো জীবনানন্দের প্রতিধ্বনি, কিন্তু তা-ও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।[৪]

প্রত্যাশিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অভাবই ছিলো নতুন মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক বিক্ষোভের উৎস। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিতায় সেই অসন্তোষের পরিচয় মেলে। ক্রমাগত বিপর্যয়ের আঘাতে মধ্যবিত্ত মানসের স্বপ্নাবলি কেবলি ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও অভিব্যক্তি বাংলাদেশের কবিতার সাধারণ লক্ষণ। সামাজিক অভিজ্ঞতা অভিন্ন হলেও সকল কবির প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না এবং সেটা আকাঙ্ক্ষিতও নয়। শামসুর রাহমান থেকে নির্মলেন্দু গুণ পর্যন্ত কবিকর্মীদের আবেগ তাই বিচিত্র ধারায় উৎসারিত। কবিতার সনাতন বিষয় প্রেম ও নিসর্গকে এরা প্রত্যাখ্যান করেননি। কিন্তু এই কবিদের রচনায় পূর্বসূরি জসীমউদ্‌দীনের একমাত্রিক এলিজি যেমন অনুপস্থিত তেমনি শাহাদৎ হোসেন অথবা আবদুল কাদিরের রূপ-তন্ময় ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গিও।[৫]

আহসান হাবীবের কবিতার মুখ্য ব্যাকরণ সমাজসচেতনতা। তাঁর কবিতার Social Sence[৬] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের Simple Songs[৭] লোকজ বাস্তবতার অতি সাধারণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ছবি, ঐতিহ্য সচেতনা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মৃত্যু-ভাবনা, প্রেম-ভাবনা, ইতিহাস-সচেতনা, অবচেতনা, কাল বা সময় কিংবা স্বদেশ ভাবনা তাঁকে তিরিশোত্তর কবিতায় এক বিশিষ্ট (উচ্চকণ্ঠ নয়) নম্র অথচ শক্তিশালী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আহসান হাবীব শব্দ সম্পর্কে সচেতন। সে সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে পরিচিত শব্দের সার্থক ব্যবহারে। হাসান হাফিজুর রহমান বাংলা কবিতার ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে

---

৪. আবু হেনা মোস্তাফা কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯
৫. ঐ, পৃ. ১৩৯-৪০
৬. Zillur Rahman Siddique, *Literature of Bangladesh and other Essays*, p. 5
৭. Kabir Chowdhury (ed), *Bangla Academy Journal* Summer, 1970, p. 95

প্রথমেই বলেছেন—প্রথম থেকেই এর ভাষা লোকের মুখের ভাষা।[৮] এই লোকমুখের ভাষা আহসান হাবীবের কবিতাকে একদিকে যেমন বিশিষ্টতা দিয়েছে অপর দিকে তেমনি সমাজ-বাস্তবতার নিখুঁত চিত্র প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্তে রচিত 'ছহি জঙ্গনামা' কবিতার কুমির ও বাগ অত্যাচারী এবং শোষকের প্রতীক হিসেবে এসেছে, অপর দিকে 'হুজ্জত সরদার' সংগ্রামী চেতনার বলয়ে নিজের অহংকে প্রকাশ করে এক দার্ঢ্য উচ্চারণে –

জ্বি হুজুর একদিন এই দুই হাতে	=	৮ + ৬
লড়েছি এগারো হাত কুমিরের সাথে,	=	৮ + ৬
গাঙের কুমির টেনে তুলেছি ডাঙায়	=	৮ + ৬
ভেঙ্গেছি বাঘের মাথা এই বাম পায়ে	=	৮ + ৬
এক হাতে ঠেকিয়েছি পঞ্চাশ লেঠেল	=	৮ + ৬
দশখানা লাঠি নিয়ে দেখিয়েছি খেলা	=	৮ + ৬
হুজ্জত সরদার আমি মানুন এবিন।	=	৮ + ৬

(ছহি জঙ্গনামা)

'প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা' কবিতায় হাবীব পুঁজিবাদী সমাজের অপরিসীম লালসাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। কারণ সম্পদের লালসা মানুষে মানুষে গড়ে তুলেছে বিভেদের প্রাচীর, বৈষম্যের দালান, এবং সম্পদগর্বে ভুলেছে 'আপন আত্মীয় এবং শিশুপুত্র কিশোরী কন্যার মুখ' এবং 'একদা/...সোনার কুৎসিত কর্কশ কাঠিন্যে প্রাণ-ওষ্ঠাগত'। ফলে কবির প্রাণ ধনবাদী বিশ্বে একবিন্দু নির্মল জলের প্রার্থনায় ব্যাকুল। 'মিডাসে'র প্রতীকের আড়ালে ধনবাদী বিশ্বের কুৎসিত চেহারাকে তিনি কবিতায় মূর্ত করেন এভাবে :

কেটেছে কৈশোর
কৈশোরের আরাধনা করেন যৌবনে
বিলিয়ে নিঃশেষ করে সুচতুর বরদাতা বাক্কাস-এর পায়ে
প্রমত্ত মিডাস আমি দেহের প্রাণের

---

৮. হাসান হাফিজুর রহমান, 'বাংলা কবিতা : জীবনীশক্তির একটি দিক', *আলোকিত গহ্বর*, পৃ. ১২৩

সব সুধা লাবণ্যের বিনিময়ে অন্য এক বন্দরের ঘাটে
কুড়াই অশেষ সোনা দিনরাত্রি।

এখানে মিডাস[৯] পুঁজিবাদী সমাজের অপরিসীম লালসার প্রতীক। মিডাস গ্রীকপুরাণে ফ্রিজিয়ার রাজা। সুরাদেবতা বাক্কাস[১০] এর বন্ধু। মিডাস বাক্কাস-সহচর সইলেসানকে[১১] এক বিপদ থেকে রক্ষা করার প্রেক্ষিতে বাক্কাস তাকে বর দিয়েছিল যে, মিডাস যা স্পর্শ করবে তাই সোনা হয়ে যাবে। মিডাসের মতো ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সম্পদ লেলিহানজিহবা কবিকে এখানে ক্ষুব্ধ করেছে।

বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগের ভেতর থেকেও উঠে এসেছে এই সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের চলচ্ছবি। রাগ-অনুরাগ, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, সংগ্রাম-প্রতিবাদ, ভালোবাসা-অভিমান—সর্বোপরি স্বদেশের প্রতি আহসান হাবীবের অকৃত্রিম ভালোবাসা কাব্যরূপ পেয়েছে এইসব পঙক্তিতে।

স্বভাবোক্তি অলংকার : শহর পিরোজপুর
সরকারী স্কুলের খেলার মাঠ
পশ্চিমে প্রশাসকদের বাড়ি-ঘর।
পূর্বে স্কুল-বাড়ি, সামনে বাগান, তার সামনে পুকুর
উত্তরে আদালত কাছারি
দক্ষিণে উকিল মোক্তার ইত্যাদি
মাঠে রাত ন'টার অন্ধকারে পাথরের মত ভারি
সেই মাঠের মাঝখানে দু'হাঁটুতে জোড়াহাত
তার ওপরে কপাল
আমি একদিন কেঁদেছিলাম।

---

৯. ফরহাদ খান, মিডাস, প্রতীচ্য পুরাণ, পৃ. ১৭২-১৭৩

১০. বাক্কাসের অন্য নাম ডায়োনিমাস। ঐ, পৃ. ১৬৫-১৬৬

১১. সাইলেনাস : কৃষকদের সঙ্গে ঝগড়া করায় কৃষকেরা তাকে বেঁধে রেখেছিল গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে। ঐ, পৃ. ১৭৩

উপমা :

১. দিনগুলি মোর বিকল পক্ষ পাখির মতো (রা. শে)

২. এবার বন্যার মতো আঁখিজল আনুক বিদ্রোহ (রা. শে- ৫৪)

৩. বিনয়ী মোষের মতো সন্ধ্যাবেলা একে একে/সার বেঁধে রাস্তায় দাঁড়াই।
(ঐ-৩৮)

উৎপেক্ষা :

১. এ মানুষ চলে যেন মৃতের মিছিল, (রা. শে. ৪৩)

২. চিত্রিত দেশের
চূর্ণ আভা জ্বলে দেখ
মিছিলের সব মুখে মুখে
সব মুখ দেশের আত্মার আরশি যেন।
সব মুখ দেশের আরশিতে আঁকা যেন
সারাদেশ সবই মিছিলে (আ. ব. ৪৬)

অনুপ্রাস :

ভয়ে ভীত শত শত সভ্যতার চতুর দালাল।

শব্দের সাঙ্গীতিক ধ্বনিকে আশ্রয় করে গদ্যছন্দের কবিতায় পাওয়া যায় সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অসন্তোষ ও সংক্ষোভের চিত্র :

পৌরসভার সভাপতি মহোদয়,
মানি, রাস্তা থেকে জঞ্জাল সরাবার ব্যবস্থা আপনার পরিপাটি
পানি সরবরাহের ব্যবহার (যেমন ওয়াসা ব্যর্থ)
আপনার ত্রুটি নেই কোনো
বসন্ত রোগের গতিবিধি আপনার চোখ এড়ায় না
নিয়মিত শুনতে পাই আপনার হুশিয়ারি
ছড়িয়ে পড়ে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায়
.আপনাকে ধন্যবাদ
(মে. ব. চে. যা. ১৫)

পঞ্চাশের দশকের শেষ ও পুরো ষাটের দশক জুড়ে যে সময়টি অতিবাহিত হয়েছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নানাবিধ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে ঐ সময়টিই আমাদের জাতীয়-চৈতন্যের মৌলিক চরিত্রটিকে প্রকটিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে এ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির বিকাশ ও পরিণতি ঘটে ঐ সময়েই। আর্থ-সামাজিক প্রতিবেশের বিভিন্ন ঘটনার অভিঘাতে পঞ্চাশের ও ষাটের দশকের বাংলাদেশে বোধ ও চেতনায় বিপুল পটপরিবর্তন ঘটেছে। সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতার পর একদিকে যেমন কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি ঘটেনি, তেমনি ক্রমাগত ঔপনিবেশিক শক্তির অশুভ আক্রমণে আমাদের মানসজীবন ছিলো পর্যুদস্ত। এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াতেই ষাটের দশকে আমাদের জাতীয় চেতনা দানা বেঁধে ওঠে এবং ধীরে ধীরে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে জাতির অন্তরাত্মা। আমাদের সেই সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক উর্দ্বতনে 'সমকালের' অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[১২] ১৯৫৭ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় 'সমকাল' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। "এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে নতুন লেখক সৃষ্টি ও মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা হিসেবে তাঁর (সিকান্দার আবু জাফরের) দান অবিস্মরণীয়, আর সমকাল তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"[১৩]

সিকান্দার আবু জাফরের অধিকাংশ কবিতায় সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে কবি লিখেছেন, "সমাজের সঙ্গে কথা বলতেই আমার বেশি আনন্দ।"[১৪] এ সমাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর কাব্যজগৎ। প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই প্রকাশিত হয়েছে চাপা বিক্ষোভ ও অসন্তোষ, কিন্তু কবি হতাশায় আচ্ছন্ন হননি। অসন্তোষের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে একটা আশ্বাসের আভাস। একদিক থেকে সিকান্দার আবু জাফরকে নিঃসন্দেহে সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বার বার দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছে সংগ্রাম ও

১২. হায়াৎ সাইফ, *উক্তি ও উপলব্ধি*, শিল্পতরু, ১৯৯২, পৃ.৩

১৩. মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকানদার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১১

১৪. সিকান্দার আবু জাফর, *প্রসঙ্গ কথা, প্রসন্ন প্রহর*, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা

আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যেতে পারে না। তাই তাঁর উচ্চারণ :

প্রদীপ্ত ইঙ্গিতে তার পার হবো একদা এ রাত্রির আকাশ বারবার
ভুলে যাবো ব্যর্থতার তিক্ত ইতিহাস। অকম্পিত আমার এ হাতে
রাখো পূর্বাশার প্রভাদীপ্ত হে প্রভাত। নতুন প্রভাত
(প্রভাত, প্রসন্ন প্রহর)

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত 'ফাল্গুন হক গান' কবিতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। অতীত স্মৃতিচারণার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের দুঃসহ যন্ত্রণার তুলনা করে সাম্রাজ্যলোভীদের বীভৎস আচরণের প্রতি ব্যঙ্গ-মুখর হয়েছেন এবং পরিশেষে মানবতার অসম্মানে ব্যথিত হয়ে বলেছেন —

মারণমন্ত্রে মুখর কণ্ঠ বোমারু বিমানগুলো
সেদিন আকাশে হয়নি হাজার তারা।
সেদিন ছিলো না জীবনধাত্রী ধরা।
নির্মম এতোখানি,
মানুষের ছিলো বুকভরা প্রীতি প্রেম।
(ফাল্গুন হক গান, প্রসন্ন প্রহর)

সমাজচিত্রমূলক বেশকিছু কবিতায় বিম্বিত হয়েছে কখনো সমকালীন রাজনৈতিক ধূর্ততা ও স্বার্থপরতার চিত্র, কখনো গ্রামীণ জীবনের কুটিল রাজনীতি, দারিদ্র্যপীড়িত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। এ ধরনের কবিতার মধ্যে অগ্নিগিরি, তিমিরান্তিক, দিগন্ত কারাগার, সমস্বর, বিক্ষুব্ধ ঘোটক, পথ হাঁটছে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'তিমিরান্তিক' কবিতাটিতে কবি সমাজের একটি অন্ধকারময় দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অনিবার্যভাবে এসেছে সেইসব শব্দ যা দৈনন্দিন জীবন থেকে আহৃত। ঘেয়ো কুকুর, কুকুর শাবক প্রভৃতি এসেছে রূপক হিসেবে —

বসন্ত পূর্ণিমার প্রস্তুতির জন্যে
ধৈর্য ধরবে না বলে
রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুর

তাকে টেনে নিয়ে যাবে
ডাস্টবিনের অন্ধকারে
উপহার নেবে
অনেকগুলো বিধ্বস্ত মুহূর্ত।
(তিমিরান্তিক, 'কবিতা ১৩৭২')

'দিগন্ত কারাগার' কবিতাটি সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশ অবলম্বনে রচিত। সাম্রাজ্যবদী শোষক ও শাসক শ্রেণী, যাদের শোষণ এবং শাসনে সাধারণত জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, অবারিত দিগন্ত আবৃত করেছিলো যাদের কুটিল যন্ত্রণা তাদেরই উদ্দেশে এ কবিতাটি রচিত। এরা শোষণ ও শাসনের অত্যাচারে মানুষের সহজ সূর্যের হাসির মতো আনন্দকে রূপান্তরিত করেছে ব্যর্থতার কান্নায় —

আমি ত' জানিনে কোথা আছে সেই যন্ত্রাগার
যেখানে আগুন গলিয়ে গলিয়ে প্রত্যহ
সহজ হাসিকে কান্নায় করে রূপান্তর।
(দিগন্ত কারাগার, 'কবিতা ১৩৭২')

উপমা :

১. ভাঙ্গা শামুকের খোলার মতন
যে আমার পায়ে পায়ে
ধারালো দাঁতের ছোবল বসিয়ে
রক্ত ঝরায়
কি করে ঢাকব— আড়াল করব তাকে?

২ বহু বুভুক্ষা ছেয়ে
অনেক নিথর মৃত্যু নামছে
দীর্ঘ ঘুমের মত।

রূপক :

১. সে রাত্রির নীরবতা রোমাঞ্চ আনেনি
রক্তপায়ী শকুনেরা দিয়েছিল হানা

২ অধিকার নিতে এসে যারা দিল প্রাণ
তাদের ক্রন্দসী ডাকে আজি পূর্বাশার
নৈশাচারী পেঁচকের অমঙ্গল গান।

সিকান্‌দার আবু জাফরের কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষ তথা জনতা। এই জনতা ও তাদের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যের বিভিন্ন ধরনের উপমা ও রূপকে ব্যবহৃত হয়েছে এই সমাজ থেকে উঠে আসা শব্দাবলি। বিশেষত শকুন, কুকুর, রক্তপায়ী বাদুড়, রাত্রি, আলো, প্রভাত, (যাগ, স্বপ্ন, পূর্ণিমা, সূর্য প্রভৃতি শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে এইসব উপমা ও রূপকে। স্বর, মাত্রা ও অক্ষরবৃত্ত – এই তিন ধরনের ছন্দই সিকান্‌দার আবু জাফর ব্যবহার করেছেন সফলতার সঙ্গে।

আবুল হোসেনের কবিতায় যেমন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, দেশকাল সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজ-বাস্তবতার চিত্র প্রতীকায়িত হয়েছে তেমনি তার আঙ্গিক নির্মাণে আছে সযত্ন প্রয়াস। কবিতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ : "আমার চিন্তা, আমার ভাবনা, আমার অভিজ্ঞতা, সবই তো আমার প্রতিবেশের হয়ে রঞ্জিত হতে বাধ্য। ... যতই ব্যক্তিগত হোক আমার প্রতিক্রিয়া, আমার অভিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক জীবনে যাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় অথবা আমি যা যা দেখি, তাদের সকলের বিবেক এবং চেতনা আমার কবিতায় প্রতিফলিত, প্রতিধ্বনিত হবেই।"[১৫] আর এ কারণেই সমসাময়িক দেশকাল তাঁর কবিতার একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে –

আমার মন এক ছোট দ্বীপ
নিঃসঙ্গ নির্জন। ...
শুনিনি পাখির ডাক বাঘের গর্জন

১৫. আবুল হোসেন, 'আত্মবিবৃতি', *স্বনির্বাচিত*, পৃ. ২২

মানুষ তো আরো দূর।
শুধু আছে সমুদ্দুর যতদুর দেখা যায়।
আর আছে তারও চেয়ে নিষ্ঠুর সময়।
(দ্বীপ)

সময়ের পটভূমিতে ব্যক্তিক নৈঃসঙ্গ্যবোধ এবং মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধ জীবনকেই উপজীব্য করে তোলা হয়েছে এখানে। আধুনিক মানুষের জীবন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। আর এ রকম পরিস্থিতিতে সব কিছুই কবির কাছে মনে হতে পারে অসহনীয়, অস্তিত্বের বিরোধী বলে। আবার এই পরিবেশকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা নেই বলে তিনি জর্জরিত হতে পারেন আত্মবিদ্রূপের শাণিত ব্যঙ্গবাণে :

তবু বেঁচে আছি।
সকালে নাস্তা, দুপুরে বালিশ,
মাঝে মাঝে ছুটি হাওয়া বদলানো,
ঘরোয়া তর্কে আকাশ ফাটানো।
কখনো ঢাকা কখনো করাচি।
(বাঁচবো কি)

সমকালীন মধ্যবিত্তের জীবনচরিত ব্যক্ত হয়েছে এখানে। এই সহজ সরল বাণীর ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে সমকালীন সমাজের চিত্র। তবে একথা বলা যায়, আবুল হোসেনের কবিতা প্রথমত দেশ–চেতনা এবং দ্বিতীয়ত জীবনপ্রীতির কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে —

ধান তো আর নেই পাটও শেষ
বছর বছর ডোবে দেশ।
(দেবো, সব দেবো)
আমাদের গান মেশে
উত্তরে পশ্চিমে পূবে চলতি হাওয়ায়,
আওয়াজ ছড়ায়

দেশে দেশে, আমাদের প্রাণের স্বদেশ।

(স্বদেশী কোরাস)

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামই মূলত এইসব কবিতার উৎস। "আবুল হোসেনই বাঙলাদেশের প্রথম আধুনিক কবি। আধুনিক কবিতার মৌল স্বভাবটি তিনি সবচেয়ে ভালো বুঝতে পেরেছিলেন।"[১৬] আমাদের মধ্যে আবুল হোসেনই প্রথম কবি যিনি সাম্প্রতিক আঙ্গিককে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে আপন স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা কবিতার উচ্ছ্বাস এবং উচ্চসুরকে সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করে আধুনিক কালের সময়-সচেতনতায় তিনি তাঁর কবিতাকে উন্মুখর করেছিলেন।[১৭] কবিতার ভাষা-ব্যবহারেও তিনি সচেতন ছিলেন। তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি বা লোকজ ও বিদেশি শব্দ ব্যবহার করে তৎকালীন সমাজের নানা চিত্র তিনি অকাতরে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লাইন ধরে কুলিরা দাঁড়ায় কিচির মিচির সারাক্ষণ
চ্যাঁচায়, খাবার চাই, টাটকা খাবার, সাঁচী পান, তানসেন
ট্যাবলেট, চাই সিগারেট, বিড়ি, পাউরুটি ফিরপোর,
গরম চা, শোরাবজীর তকমা-আঁটা খানসামার ট্রের উপর

উপমা :

বেলাভূমিতে ঝিনুকের মতো অগণ্য দ্বীপ হঠাৎ
মেঘের ফাঁকে দেখা দিলো চাঁদ
ডাফরীনে মুমূর্ষ পাণ্ডুর মেয়ের মতো।

(ঘোড়সওয়ার, নব বসন্ত)

হয়তো সন্ধ্যায় ডেকে উঠবে শেয়ালের পাল
ভূতের মতন অন্ধকারে, সোনালী ধানের মতো রোদ আসে।

(উত্তরাধিকার, নব বসন্ত)

---

১৬. হাসান হাফিজুর রহমান, *আধুনিক কবি ও কবিতা*, ঢাকা, ২য়. স. ১৯৭৩, পৃ. ২৫৪
১৭. ফজলে রাব্বি, (সম্পাদিত), *বই*, জুলাই ১৯৮২, পৃ. ১

উৎপ্রেক্ষা :

বালুকার ব্যাকুলতা, ক্লান্ত রাতে মায়াময় চাঁদ
আমার মনের পাতে পড়ে যেন তাহারই প্রসাদ।

স্বভাবোক্তি :

আমরা তো ডুবে আছি মৃত্যুর অতল অন্ধকারে

নিশ্চয় :

'তোমরা যাও'
আমি বরং এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো।

আবুল হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিরস সংলাপে' অনেক সার্থক ও সুন্দর চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ মেলে, যার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে তৎকালীন সমাজের বাস্তব প্রতিচ্ছবি —

ঢাকার গর্তে ভরা রাস্তায় ঠেলাগাড়িতে
যেমন হড়হড় করে গরুর গোশত নিয়ে যায়
রঙচটা স্ট্রেচারে দুমড়ানো সাদা চাদরে মুড়ে
হাসপাতালের ট্রলি ডাক্তার নার্স আয়া আর
ওয়ার্ডবয়দের ভিড় ঠেলে সরু করিডর দিয়ে
এঁকে এঁকে নিয়ে গেলো তাকে।

অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, গদ্যছন্দ এমন কি ফ্রি ভার্সে কবিতা লিখে আবুল হোসেন শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চাশের মধ্য পর্যায়ে বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সূত্রে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সৈয়দ আলী আহসানের কাব্য-ভাবনা। ইতোপূর্বে দোভাষি পুথি অবলম্বনে লেখা তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চাহার দরবেশ' (১৯৪৫) তাঁকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি। ফলত, ইসলামি ভাবাবহ অনুষঙ্গ ত্যাগ করে তিনি আধুনিক বিষয়বস্তু এবং ভাষারীতি গ্রহণে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। বহির্জাগতিক কোনো সংকট নয়, মানুষের সকল চৈতন্যকে অনুভব করার চেষ্টায় দেহকেই অস্তিত্বের সারাৎসার হিসেবে গ্রহণ

করেন তিনি। এই অস্তিত্ব অনুভবের অর্থ হলো দেহ, প্রেম, হৃদয়, কামচেতনা, সৌন্দর্যতৃষ্ণা, প্রকৃতি এসবকে ঘিরেই মানবিক আবর্তন, অন্বেষা ও আস্বাদন। স্বদেশ চেতনার অন্তরঙ্গ অনুভবও তাঁর কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

হোরেস (খ্রি. পূ .৬৫- ৮) তাঁর Ars Poetica-য় বলেছেন, কবিদের জন্য আমি এই অবশ্য পালনীয় সূত্র নির্দেশ করছি যে, অভিজ্ঞ কবি সর্বদাই আদর্শের জন্য মনুষ্য জীবন ও চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং তা থেকে জীবনের সত্যিকার রূপের ব্যঞ্জনা দিতে সমর্থ ভাষাভঙ্গি আবিষ্কার করবেন।[১৮] সৈয়দ আলী আহসান কাব্যসাধনার প্রারম্ভে এই ভাষাভঙ্গি আবিষ্কার করতে না পারলেও তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অনেক আকাশ'-এ প্রচলিত শব্দকে নতুন ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেছেন। এরিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) বলেছেন - কবিতার ভাষায় সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে এই যে, তা হবে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। এই স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা সৈয়দ আলী আহসানের কবিতার মৌলধর্ম। অতি পরিচিত শব্দে গঠিত 'আমার পূর্ব বাঙলা' শিরোনামে তিনি যে তিনটি কবিতা লিখেছেন তার প্রথম কবিতার অংশ —

> আমার পূর্ব-বাংলা কি আশ্চর্য
> শীতল নদী
> অনেক শান্ত আবার সহসা
> স্ফীত প্রাচুর্যে আনন্দিত।
> (আমার পূর্ব বাঙলা, একক সন্ধ্যায় বসন্ত)

সৈয়দ আলী আহসানের দৃষ্টিতে এই হচ্ছে ষাটের দশকের পূর্ব বাংলা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপুঞ্জ নিয়ে যখন সমকাল-সম্পৃক্ত, ঘটনামুখ্য কবিতা লেখা হচ্ছে, তখন সৈয়দ আলী আহসান শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে দেখছেন পূর্ব বাংলার সজীব প্রগাঢ়রূপ। রাজনৈতিক বা জাগতিক কোনো সংগ্রাম নয় চিরায়ত সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন তিনি। হয়তো সমকালীন সমাজ-বাস্তবতাকে তিনি কবিতায় প্রতিফলিত করতে চাননি। কেননা, পূর্বাপর তিনি জনতার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে শাসকচক্রের সঙ্গেই সম্পৃক্ত থেকেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজের ঘাত

---

১৮. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত, *হোরেসের কাব্যতত্ত্ব*, পৃ. ২৬

প্রতিঘাত, দুঃখ-দারিদ্র্য, সংগ্রাম-প্রতিবাদের কোনো চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, জীবনানন্দের কাব্যভঙ্গির প্রভাব তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট।

বাংলাদেশের বর্তমান কালের যে কবিকৃতি তা বোধগম্য কারণেই এদেশের জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্য-সমূহকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। আর এই ধারণকৃত বিষয়-আশয়ে যে জীবনবোধ ও বিশ্ববীক্ষা তা এদেশেরই জাতিগত চৈতন্যের প্রতিভাস, যদিও তা বিভিন্ন সময়ের নান্দনিক উৎকর্ষের প্রতুলতা বা অপ্রতুলতার ও অন্যান্য বহুবিধ বিশিষ্টতায় বিচিত্রভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু নান্দনিকভাবে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হওয়াটা মূলত আমাদের যৌগিক অবচেতনের জীবন প্রত্যয় ও চূড়ান্ত বিচারে পুরুষার্থের উদ্বোধনের ওপরেই প্রধানত নির্ভরশীল। বলা বাহুল্য, জাতীয় চেতনার যে বিপুল জোয়ার একাত্তরের যুদ্ধে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছিল তার তরঙ্গভঙ্গ সময়ের ব্যবধানে আজকে থিতিয়ে এলেও ঐ সময়ের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষা এদেশের বর্তমান সমাজের আত্মপরিচয়ের স্থায়ী চিহ্নসমূহকে সনাক্ত করেছিল নিঃসন্দেহে। এবং সেই চিহ্নসমূহ প্রধানত এই মাটি ও মানুষেরই জীবন ও জীবিকার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত।[১৯]

বিভাগোত্তর বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচারে কবিকৃতির কয়েকটি অন্তর্নির্হিত বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে বর্তমান কালের দিকে অগ্রসর হলে অবশ্যম্ভাবীরূপে লক্ষ্য করা যাবে এই সময়ে রচিত কবিদের কাব্যের যে চারিত্র্য তা প্রকৃতপক্ষে যে সমাজ থেকে তাঁদের উদ্ভব সেই সমাজবাস্তবতা, তার দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। কবি যেহেতু সমাজ বহির্ভূত কোনো মানুষ নন, তাই এই সমাজেরই হাসি-কান্না, দুঃখ-সুখ, বিদ্রোহ-বিপ্লব এবং রক্তপাতের ভেতর দিয়ে সমৃদ্ধ হয় তাঁর অভিজ্ঞতালোক। কবিতা এক অর্থে অভিজ্ঞতারই নির্যাস। সমাজ-জীবনের এই পটভূমিতে কবি আবদুল গনি হাজারীকে কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী, শ্রেণী কিংবা স্কুলভুক্ত করা কষ্টসাধ্য। তিনি লিখতে শুরু করেন চল্লিশের দশকের শেষ দিকে, লিখেছেন পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে, মৃত্যুর পূর্ব অবধি, সত্তর দশকের গোড়ার দিকেও। স্পষ্টতই ধর্মীয় ঐতিহ্য যাঁদের কবিতার অন্যতম মৌল প্রেরণা যেমন ফররুখ আহমদ, তাঁদের সঙ্গে হাজারীকে এক পঙক্তিতে ফেলা যাবে না। অথচ হাজারীর অনেক কবিতায় মুসলিম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, তার সঙ্গে

১৯. হায়াৎ সাইফ, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩৩

সম্পৃক্ত শব্দাবলি, চিত্রকল্প ও উপমা, মাঝে মাঝে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে হুবহু 'আরবী চরণে'র সংযোজন লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু তাঁর কাব্যে এই ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপস্থিতি পুরুজ্জীবনবাদী নয়, পুনর্জাগরণবাদীও নয়, তা তির্যক, কখনো কখনো ব্যঙ্গধর্মী, কখনো কখনো ভিন্ন পরিবেশের পাশে বৈপরীত্যের চিত্র নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। এক কথায় তা গতানুতিক, প্রাচীনপন্থী, প্রধানত অনুভূতি আশ্রয়ী নয়, তা নিরীক্ষাধর্মী, আধুনিক এবং প্রধানত বুদ্ধিনির্ভর।[২০] আবদুল গনি হাজারীর কবিতায় চল্লিশের কবিতার অনেকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে – গদ্য কবিতা, সাধারণ মানুষের জন্য মমত্ববোধ ইত্যাদির দিক থেকে তাঁর অবস্থান চল্লিশের বামপন্থী কবিতার পাশেই। ... আর কাব্যিক কুশলতা হিসাবে এসেছে গদ্য-আত্মকতা– শব্দে, বাক্যে, ছন্দহীনতায়, জীবন ব্যবহারে, নাট্যীভবনে, পুরাণের প্রয়োগ, উপমার পৌনঃপুনিকতা, উপর্য্যুপরি বিচ্ছিন্ন উল্লেখ।[২১]

আধুনিক কবিতার অন্যান্য লক্ষণ যা আমরা আবদুল গনি হাজারীর কবিতায় লক্ষ্য করি, তা হচ্ছে নাগরিক আবহ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, সমাজের ভাঙ্গা-গড়া তথা শ্রেণী বৈষম্য সম্পর্কে সচেতনতা এবং এই সবের প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও একটা তির্যক ব্যঙ্গের সুর। রাজনীতির আবহও তাঁর কাব্যে উপস্থিত কিন্তু তা মৃদু এবং পরোক্ষ। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব তাঁর কবিতায় দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত। শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নগর-সভ্যতার পচন সম্পর্কে কিন্তু হাজারীর প্রতিক্রিয়া তীব্র। ঐশ্বর্যের ঝিলিমিলি শহরে তিনি দেখেছেন :

কারখানার নর্দমা
শতাব্দীর শরীরে সভ্যতার নিষ্ঠীবন
পাট কোম্পানির লঞ্চে
অপ্রাসঙ্গিক উৎস

(অপ্রাসঙ্গিক উৎসব)

হাজারী বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের বিবিধ সংকটের অনবদ্য রূপকার। 'প্রেস ক্লাবে তোমরা' কবিতায় একদিকে ব্রিজের হুল্লোড়, অন্যদিকে দরিদ্র পিওনের ওভারটাইমের

---

২০. কবীর চৌধুরী, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, শিল্প তরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৭৪
২১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *আবদুল গনি হাজারী*, বা/এ, ১৯৮৯, পৃ. ৯৮

দেনা, বাড়িতে অসুস্থ কন্যা, শিয়রে ম্লান প্রদীপ আর দাগকাটা শিশি, এবং

মায়ের প্রার্থনা,
দয়ালু ডাক্তার
(এম. বি. হোমিও)
হাতযশ
আর সব আল্লার হাত।

শ্রেণী-বৈষম্যের চিত্রটিতে আরো তীক্ষ্নতা এনে দিয়েছে এই সত্য যে, পিওনের পকেটে রয়েছে বাড়ি পৌঁছে দেবার চিঠি, ককটেল নিমন্ত্রণের। অসুস্থ কন্যার কাছে তাড়াতাড়ি তার ফেরার উপায় নেই, মালিকের কাছ থেকে আগাম বেতন বাবদ কিছু পাবার সম্ভাবনাও শূন্য, তাতে নাকি প্রভুর নিশ্চিত ক্ষতি।

সমাজের একটি ক্ষেত্রে অবক্ষয়র নিপুণ চিত্রাঙ্কনে হাজারী বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তা হলো জাগতিক সাফল্য - অভিসারী উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্র। এ প্রসঙ্গে কবির জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি বহন করে আনা 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। হাজারীর অন্যান্য কবিতার মতো এটাও ড্রামাটিক মনোলগ, যদিও কথাগুলি কোরাসে উচ্চারিত বহুবচনে। উক্তিটি কতিপয় ধনী গৃহিণীর, উচ্চপদস্থ আমলার স্ত্রীদের। টাকা-পয়সার অভাব নেই, কসমেটিকসের অভাব নেই, স্বামীর পদাধিকার বলে নানা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে সম্মানিত অতিথির আসন লাভে ঘাটতি নেই, কিন্তু শান্তিও নেই ; তৃপ্তিও নেই, জীবনে কোন আনন্দ নেই। এই কতিপয় আমলার স্ত্রীর বিশ্রামে বিধ্বস্ত।

কোমরের উপত্যকায় মেদের আক্রমণ
উদরের স্ফীতি
চিবুকের দ্বিত্ব
স্তনের অস্বাস্থ্যে শঙ্কিত

প্রায় সমধর্মী কবিতা হচ্ছে 'সেই লোকটি'। এটাও নাট্যরসাত্মক কবিতা। বক্তা এখানে একটি লোক, একজন স্বামী, নিজের উন্নতির জন্য যিনি স্ত্রীকে পর্যন্ত ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি —

কোনোদিন নিয়ে গেছে সাকুরা-চু-চিনে
কখনো সুযোগ বুঝে মনে হয় আরণ্য ভোজে
শ্রীপুরের বনে —।

কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা প্রশান্ত চিত্তে আর এখন তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না, অসম্ভব জ্বালা ধরছে সারা শরীরে, ক্ষোভ-ক্রোধ-ঈর্ষা-বিদ্বেষ উপচে পড়ছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

তৎকালীন সময়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বৈষয়িক উন্নতির জন্যে এ ধরনের আচরণ ছিলো সমাজ-বাস্তবতারই একটি স্তর। এই চিত্রেরই অনবদ্য রূপকার আবদুল গনি হাজারী। অধিকাংশ কবিতায় হাজারী গদ্যকবিতার ধারাকে অনুসরণ করেছেন। সম্ভবত বিষয়বস্তুর কারণে, আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে, নাটকীয়তার দাবিতে তাঁর কবিতায় মুসলমান ঘরোয়া পরিবেশে ব্যবহৃত অনেক শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দ ও বাক্যাংশও তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন —

সুনামাজীর তৃপ্তির মত
আজানী কণ্ঠের প্রতিধ্বনির মত
মসজিদের কুণ্ঠিত ডালিম গাছের
আরক্ত লজ্জার মত
তোমার সুরের রোয়াকে আমি
ভীরু গোনাগার হয়ে
প্রতীক্ষা করি :
আমি তোমার বিশ্বাসের শরীর
অবিশ্বাসের সাহস
আমি তোমার সুন্দরের স্পর্ধা

(সঙ্গীতাকে – ৩)

তিনি প্রায়শ প্রশ্নের ভঙ্গিতে বিষয়বস্তু ও ভাবমণ্ডলে তীক্ষ্ণতা এনেছেন। টাইপোগ্রাফিক্যাল বৈচিত্র্যের মাধ্যমেও তিনি কোথাও কোথাও তাঁর বক্তব্যকে তীব্রতর করেছেন। কোথাও খুব ছোট হরফ ব্যবহার করেছেন 'প্রত্যুষের অন্ধকারে দু'টি হাত'

(পঞ্চম স্তবক), আবার কোথাও লাইনকে ভেঙ্গে-চুরে আঁকাবাঁকা করে সাজিয়েছেন (ফ্রাংকফুর্ট ১৯৬৮-২)।[২২] কাব্য-ভাবনা সম্পর্কে তাঁর নিজের বিশ্লেষণ :

"আমি যে কবির কথা ভাবি সে হলো আধুনিক সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ — শিক্ষিত, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত, ঐতিহ্য, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে অবহিত এবং তীক্ষ্ণ সংবেদনশীল অথচ বিশ্লেষণী মনের মালিক। এই সব মিলিয়ে তার সমাজ-চৈতন্য রচিত, তার সামাজিক কর্তব্যবোধ বিবেক সংহত। এমন এক কবি যখন সৃষ্টিশীলতায় উদ্বুদ্ধ হয়, তখন তার কবিতায় আমরা সমাজের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পাই।"[২৩]

এই উক্তির মধ্যেই হাজারীর সমাজ-সচেতনতার ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

সমকালীন ঘটনাবলির অভিঘাতে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ ও শহীদ কাদরীর রূপান্তর নানা কারণেই স্মরণীয়। এঁরা তিনজনই পঞ্চাশের দশকে লিখতে শুরু করেছিলেন - যদিও এই দশকের শেষ দিকে কেবল শামসুর রাহমানের একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু সেই কাব্যে শামসুর রাহমান যতোটুকু পরিশীলিত ততোটুকু স্বতন্ত্র নন। কবিতার ভাষা, ছন্দ, উপমা রচনায় যতো প্রযত্ন ও প্রসন্নতা , দ্যুতি তার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু পরবর্তী দশকেই তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বের গড়ে ওঠার কাল। স্বদেশ সমাজ ও সময় শামসুর রাহমানের কবিতায় ক্রমশই নতুন উপাদান ও ভাষা যোগ করেছে। একই শহরের পটভূমিতে তিনটি আলাদা ভঙ্গিতে ফুলে উঠেছে শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী ও আল মাহমুদের কবিতা।[২৪]

আলোচ্য তিনজন কবিই নাগরিক। প্রথম দু'জনের বাচন-ভঙ্গির যে সপ্রতিভতা নগরজীবনের স্বপ্ন ও বাস্তবের ভেতর থেকে উচ্ছ্বসিত, আল মাহমুদে তার অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। আবার পুরোনো ঢাকার স্মৃতি, ছবি, কিংবদন্তি — শামসুর রাহমানের কবিতায় বিশ্ব-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সহযোগে যে পেশীশক্তির উদ্বোধক, শহীদ কাদরীর পঙক্তিমালায় তার উপস্থিতি নেই। ধাতব নগরের ধ্বনিকে

---

২২. কবীর চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১

২৩. আবদুল গনি হাজারী, 'বন্দী বিবেক, সমাজ ও কবিমান', *সমকাল*, কবিতাসংখ্যা, ১৩৭১-৭২

২৪. আবু হেলা মোস্তফা কামাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৯

তিনি ধরতে চেষ্টা করেন সুনির্বাচিত শব্দাবলিতে, কিন্তু এইসব শব্দ উঠে আসে অব্যবহিত সমাজ-পরিবেশ থেকেই। এবং প্রধানত গদ্যভঙ্গিতে ভারী তৎসম শব্দের পাশাপাশি আটপৌরে কথা-বুলি আর নির্ভেজাল গাদ্যিক ইংরেজি শব্দের মিশেল দিয়ে শহীদ তৈরি করে নেন তাঁর কবিতার ভাষা। কিন্তু আল মাহমুদ মূলত সুরেলা স্নিগ্ধ। বাংলাদেশের লোকজ জীবনের অনুষঙ্গ তাঁর কবিতায় বার বার ফিরে আসে শব্দে, উপমায়, প্রতীকে, চিত্রকল্পে।[২৫]

বাংলাদেশের কবিতাকে যাঁরা নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পঞ্চাশের কবিদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কোনো ধারাবাহিক কাব্য-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নয়, অনেকটা যেন সমসাময়িকতার আঘাত থেকে উৎপন্ন ব্যক্তির অহংবোধ ও অধিকার চেতনা কবিতাকে বিষয়বস্তু ও প্রকরণ, এই দুটি ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট করে তোলে। পরবর্তীকালে ষাট ও সত্তরের দশকে এই ধারারই বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় ব্যাপকভাবে। এই কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা কখনোই যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ধারাকে অনুসরণ করেনি ; নবোদ্ভূত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনবোধ, যেমন জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং শ্রেণীবিকাশের প্রাথমিক আবেগকে ধারণ করেছিল। এই পর্যায়ে আঘাত করা শুরু হয়েছিল ইসলামি বা পাকিস্তানি মনোভঙ্গি অর্থাৎ একধর্ম, একজাতির অলীক ধারণাসূত্রটিকে।

ষাটের দশকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বাঁক নিল ভিন্ন এক গতিপথে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে এই পর্বটিও বিভক্ত হয়ে পড়লো প্রগতিশীল চেতনার স্তরে। প্রথমার্ধে লক্ষ্য করা যায়, বন্দিত্ব, পরাজয়-চেতনা বা আত্মসংকটের শ্বাসরুদ্ধকর রূপ, আর দ্বিতীয়ার্ধে উজ্জীবনের, সংগ্রামী চেতনার অবিনাশী চেহারা। পঞ্চাশের দশকের যেসব কবি এই সময়ে কবিতা লিখছিলেন তাঁদের রচনাতেও লক্ষ্য করা যাবে এর প্রতিফলন। শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, একই কবির ভিন্ন ভিন্ন রচনায়ও মিশে আছে এই দ্বৈত বোধ। সমসাময়িক সংকটকে বর্জন করে বা একমাত্র আরাধ্য ভেবে নয়, সমকালীনতাকে অতিক্রম করবার দুর্বার চিত্তশক্তির মধ্যেও ধরা আছে তাঁদের কবিতার স্বরূপ, আধুনিকতার সাম্প্রতিক ধরন। শিল্প বা কাব্য অভিজ্ঞতাও বদলে দিচ্ছিল কবিদের ভাষাভঙ্গি এবং প্রকরণ-বিন্যাসের চারিত্র্য। সংকট

২৫. ঐ, পৃ. ১৪০

ও চৈতন্যের অবদমন থেকে কবিতা কখনো কখনো যেমন হয়ে উঠেছিল ইঙ্গিতধর্মী, বিদ্রুপাত্মক, প্রতীক ও প্রতিমা-নির্ভর তেমনি উজ্জীবনের বোধও হয়েছে বিস্তারিত এবং উন্মুক্ত। এই ধরনের কবিতার সারাৎসার হলো মানবিকতা বা অস্তিবোধ। শামসুর রাহমানের রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৬), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজবাসভূমে (১৯৭০) ও বন্দীশিবির থেকে (১৯৭২) ; হাসান হাফিজুর রহমানের অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮) ও যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২) ; আবদুল গনি হাজারীর সূর্যের সিঁড়ি (১৯৬৫) ; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের শঙ্কিত আলোকে (১৯৬৮), বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮) ও প্রতনু প্রত্যাশার (১৯৭৩) একাংশ ; সৈয়দ শামসুল হকের বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৬৯) ; ফজল শাহাবুদ্দীনের আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর (১৯৬৯) এবং আল মাহমুদের লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালি কাবিন (১৯৭৩) প্রভৃতি কাব্যগন্থে এই দ্বিমুখী চৈতন্যের দ্বন্দ্ব ও সমীকরণ লক্ষ্য করা যাবে বিশেষভাবে।

শামসুর রাহমান আলোচ্য সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি যিনি উল্লেখিত কাব্য-বৈশিষ্ট্যের গুণে অর্জন করেছিলেন সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা। ইতোপূর্বে তাঁর কবিতায় তিরিশের কবিদের যে প্রভাব এবং রোমান্টিক চেতনা লক্ষ্য করা গেছে ষাটের দশকে এসে একদিকে যেমন তিনি তিরিশের প্রভাবমুক্ত হয়েছেন তেমনি রোমান্টিকতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিপার্শ্বের সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর প্রথম দু'টি কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' এবং 'বিধ্বস্ত নীলিমা' আত্মগত কথনে ভারাক্রান্ত হলেও পরবর্তী গ্রন্থ 'নিরালোকে দিব্যরথ' থেকে প্রথমত, কিছুটা ব্যাপকভাবে সদর্থক জীবনবোধের উল্লেখ দেখা গেল ; দ্বিতীয়ত, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আগের তুলনায় অনেক বেশি জড়িয়ে গেলেন তিনি। একথা বলা যায়, 'নিরালোকে দিব্যরথ'ই হচ্ছে শামসুর রাহমানের কবি-চৈতন্যের ক্রান্তিকালীন রচনায় ভরপুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। এই সংকলন পর্যন্ত তাঁর কবিতা ছিল প্রধানত অন্তর্লীনতার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল — প্রতীক, প্রতিমায়, ইঙ্গিতে, আত্মসম্বোধনে অন্তর্মুখী। কিন্তু আবার এই গ্রন্থ থেকেই তিনি সম্পৃক্ত হলেন বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে, বস্তু পরিবেশের সঙ্গে বিজড়িত হতে থাকলেন ক্রমশই। আত্মকথনের বদলে প্রধান হয়ে উঠলো সমষ্টির ভাবনা ; প্রতীক, প্রতিমা, ইঙ্গিতের স্থলে বাগবাহুল্য, বিবরণ ও বিস্তার।

স্বদেশচেতনা, মধ্যবিত্তের পরাজয়, সমষ্টির সংকট, গণ-আন্দোলন, অভ্যুত্থান, স্বাধীনতার তীব্র জটিল সংগ্রামে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠলো শামসুর রাহমানের

কাব্যজগৎ। বিশুদ্ধ রোমান্টিক বোধ থেকে বিমুক্ত হয়ে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করেন বাস্তবতার রূঢ় পটভূমিতে। প্রকৃতি, প্রেম, দৈনন্দিনতা এমনকি ঈশ্বর-ভাবনাতেও সমকালীন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের দংশন লক্ষ্য করা যায় তাঁর এই সময়ের কবিতায় —

যখন তোমার সঙ্গে আমার হলো দেখা
লেকের ধারে সংগোপনে,
বিশ্বে তখন মন্দা ভীষণ, রাজায় রাজায়
চলছে লড়াই উলুর বনে।
(প্রেমের কবিতা, নিরালোকে দিব্যরথ)

আত্মসংকটের গহীন গহ্বর থেকে তিনি উচ্চারণ করেন —

তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার?
উনিশ শো বায়ান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
সে ফুলের একটি পাপড়িও ছিন্ন হলে আমার সত্তার দিকে
কত নোংরা হাতের হিংস্রতা ধেয়ে আসে।
এখন তোমাকে নিয়ে খেঙরার নোংরামি
এখন তোমাকে ঘিরে খিস্তি-খেউড়ের পৌষ মাস।
তোমার মুখের দিকে এখন আর যায় না তাকানো,
বর্ণমালা আমার, দুঃখিনী বর্ণমালা।
(বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, নি. বা .ভু.)

পিতৃপুরুষের সনাতন বিশ্বাসে আস্থা নেই, দেশকে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন দুঃখিনী বর্ণমালাকে, কিন্তু ভালোবাসার ব্যবসায়ীদের প্রতি দুর্মর সন্দেহ, সভ্যতার বিপর্যয়ে শঙ্কিত চতুষ্পার্শ্বে দেখছেন শত্রুর ছায়া, গণ্ডারের যাতায়াত - এই হচ্ছে শামসুর রাহমানের মানসিক পরিমণ্ডল। মুখে শুধু বংশের বিষাদ বয়ে বেড়াচ্ছেন না, যুগের উদ্বেগ ধারণ করেছেন।[২৬]

---

২৬. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, *শব্দের সীমানা,* মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৯১

বর্তমানে আমি ফাটল-ধরা এক দেয়াল যেন একা দাঁড়িয়ে আছি-
আমাকে ঘিরে বয় ঝড়ের মাতলামি এবং অভাবিত ভূকম্পন।
কখন ঢলে পড়ি, এই তো ভয় শুধু, কালের চত্বরে হাত-পা ছুঁড়ি,
বিপুল সমারোহ জরিপ করে দেখি বিশ্বে চার ভাগই শূন্য।
(দু' এক দশকের, নিরালোকে দিব্যরথ)

এ যেন শুধু আত্মসংকট নয়, সমষ্টির মধ্যেও তিনি দেখতে পাননি জীবনীশক্তির আকাঙ্ক্ষা। ফলে যারা 'ক্ষত' দেখে, বিনা প্রতিবাদে শবানুগমনে যায়, সম্মিলিত হওয়ার পরিবর্তে দলছুট হয়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য থেকে সরিয়ে নেয় দৃষ্টি, নখ দিয়ে মাটি খুবলে তোলে তারার কবর। দেখতে চায় না 'চাঁদ ভেসে যাক অবারিত নীলে'। এ ধরনের কবিতা যখন লেখা হচ্ছিল তখন আইয়ুবী কালো দশক ছিল তার দুঃশাসন ও প্রতিপত্তির মধ্যগগনে। বিরোধী রাজনীতিবিদরা অনৈক্যের কারণে সংগঠিত হতে পারছিলেন না কিছুতেই। ইসলামি মূল্যবোধ ও সামন্তচেতনাও জেগে উঠছিল নতুন করে। কবি সেই পরিবেশকেই এখানে গেঁথে তুললেন কবর, চাঁদ প্রভৃতি প্রতীক-প্রতিমার আদলে।

বিভাগোত্তর সময় থেকে এ পর্যন্ত দেশের এমন কোনো ঘটনা নেই যার দ্বারা প্রভাবিত হননি এই কবি। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিটি আন্দোলনই আলোড়িত করেছে তাঁকে। বিশেষত 'নিরালোকে দিব্যরথ' কাব্যপর্যায় থেকেই এর সূত্রপাত। জাতীয় জীবন ও এই সময় থেকে নানা ঘটনায় হয়ে উঠেছিল উন্মুখর। হরতাল, বিক্ষোভ, রবীন্দ্র-বিতর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। শামসুর রাহমানের বিশেষত্ব হচ্ছে এইসব ঘটনাকে কবিতা করে তুলতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তাঁর কবিতা সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার দলিল। সংবেদনশীল কবিসত্তা, জীবনাসক্তি এবং আধুনিক কবিতার নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে সচেতন থাকবার কারণেই তিনি অর্জন করে নিচ্ছিলেন বিশেষ ভাষাভঙ্গি। 'সামগ্রিকভাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে ভাষার অঙ্গ থেকে ভদ্র পোষাক খুলে ফেলে তাকে আটপৌরে পোষাকে দেশে-বিদেশে ঘুরিয়ে আনার সাহস এই প্রথম দেখা গেল শামসুর রাহমানের কবিতায়। শুধু মাত্র 'প্রথম গানেই' তিনি রক্ষা করেছিলেন ভাষার নিরঙ্কুশ আভিজাত্য। সেই বনেদিয়ানা সর্বত্র সমান সার্থক ছিল না, কিন্তু যেখানে

সার্থক সেখানে এক নিবিড় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। 'রৌদ্র করোটি'র সময় থেকেই তিনি ভাষায় পোষাকিপনা আস্তে আস্তে ছেড়েছেন, ঠিক যেমন আস্তে আস্তে তিনি বদলে নিয়েছেন তাঁর নিজের মুখের আদল। 'নিরালোকে দিব্যরথ'-এর পর্যায়ে কিছু শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন, অনেকটা যেন পূর্বপুরুষের তোরঙ্গ থেকে বের করে আনা সাজ-পোষাকের মতো। অনেকটা কৌতূহলের খেলা, কিন্তু খেলাটা জমেনি :[২৭]

১. মাঝে মাঝে হঠাৎ ঘুরিয়ে নেই আপিলা-চাপিলা শৈশবের প্রচন্দ আহ্বানে

২ কিন্তু কি জানেন, অদৃষ্টের ফেরে নই অনখোলা তাই বেলা অবেলায় আতকা মুখ থেকে ফেটে পড়ে/কথা।

৩. আজাড়া কথায় কাজ কি তোমার।[২৮]

এছাড়া এক ধরনের প্রাকৃত ভঙ্গির দিকে ঝুঁকেছিলেন তিনি। এই প্রাকৃত ভঙ্গি কোনো বিশেষ অঞ্চলের বা মহানগরের বা শ্রেণীর কথা ভাষার উপর গড়ে ওঠেনি। শব্দের নির্বাচনে এই ভঙ্গির কোনো সংস্কার নেই, সাধু, সংস্কৃত, কথ্য, খেউড় স্বচ্ছন্দে একসঙ্গে চলে। এ এক অপূর্ব এবং নিজস্ব গুরুচণ্ডালি - তরল পরিবর্তনশীল, স্থিতিস্থাপক। কখনো বনেদি, কখনো মিশ্র। শব্দের এই মিশ্র রীতির মধ্যেই একটা পরিষ্কার কথ্য সুর সঞ্চারিত হয়ে যায় কখনো কখনো :

আমি ত পুলিশ নই নাগরিক দ্বীপে,
তবে সে শব্দের পিছু পিছু
ছুটে যাই, দিগ্বিদিক ঘুরে কিছুক্ষণ ফিরে আসি ক্লান্ত, ব্যর্থ।
আমার ত খুব বেশি দেরী করা চলবে না। অথচ অমন
আচমকা বিপন্নতা কিছু
কখনো না কখনো আড়ালে
আমাদের প্রত্যেকের জন্য জমা থাকে।
(একধরনের অহংকার /৩৬)

"এই প্রাকৃত ভঙ্গি তাঁর এক ধরনের এবং বিশিষ্ট প্রকাশ। এই রীতি শেষ পর্যন্ত

---

২৭. *শব্দের সীমানা,* পৃ. ৯১

২৮. ঐ পৃ. ৮৫-৮

গুটিকয় দেশজ-আঞ্চলিক শব্দের দিকে না তাকিয়ে সাধু-প্রাকৃত-মৌখিকের সমন্বয়ে এক নিজস্ব বাগধারা সৃষ্টি করে নিল। এর খানিকটা শব্দচয়নের ব্যাপার, খানিকটা ছন্দ-শাসনের ব্যাপার। এবং সবটাই কবিতাকে জৈব নিয়মে তৈরি করার ব্যাপার। যখন থেকে এ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে এল, তখন তার আলাদাভাবে কোনো পংক্তির বা স্তবকের প্রাধান্য গৌণ হয়ে গেল তাঁর জন্য।[২৯]

এই প্রাকৃত ভঙ্গিকে আয়ত্ত করে ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শাসনে বেঁধে যখন তিনি স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন তখন সেই আকাঙ্ক্ষার ধ্বনি সঞ্চারিত হয়ে যায় জনমানুষের চেতনা-স্তরে :

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান,
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।

(স্বাধীনতা তুমি বন্দী শিবির থেকে)

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তিনি রচনা করেন 'হরতাল'-এর মতো কবিতা। যা একই সঙ্গে সমকালীন বাস্তবতাকে যেমন ধারণ করে আছে, তেমনি সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহারও লক্ষণীয় -

রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙিন হয়ে বুকে
গেঁথে যায় ; একটি কি দু'টি
লোক ইতস্তত
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।

(হরতাল, নিজবাসভূমে)

---

২৯. ঐ, পৃ. ৮৭

উপমা :

ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে ; আমি একা
খড়ের গাদায় শুয়ে ভাবি
মুমূর্ষু পিতার কথা....

অনুপ্রাস :

১. কাটাই প্রহর একা ঘরে আর তুমি দেশান্তরে
২ মাথার ভেতর ঝড়ো মেঘ ওড়ে—

সমকালীনতার প্রয়োজনে, বিশশতকী বিরূপ ও জটিলতর জীবনের রূপায়ণে তাঁর কবিতার আঙ্গিকেও এসেছে নানা বৈচিত্র্য। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ছাড়াও পয়ারে, ভাঙা পয়ারে এমনকি গদ্যছন্দে রচিত অনেক কবিতা স্পর্শ করেছে উপজীব্য সামাজিক সচেতনতা। ব্যক্তি–সামাজিকের দ্বন্দ্ব, আত্মক্ষরণ এবং সামাজিক সমস্যার উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে কবি আজীজুল হকের কবিতায়। ঘটনার প্রত্যক্ষ রূপায়ণে নয়, মানবিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল আজীজুল হক একজন অত্যন্ত সংবেদনশীল কবি। সমসাময়িক ঘটনার ঘাত–প্রতিঘাতে বাহ্যিকভাবে এই কবি আলোড়িত না হলেও এই সব অনুষঙ্গকে আত্মস্থ করে নিজের ভেতর তৈরি করে নেন এক আত্মজৈবনিক দৃষ্টিকোণ। অর এ ক্ষেত্রে সমাজ, জীবন, প্রকৃতি, মানুষ এমনকি মহাকালও উঠে আসে এক ভিন্ন মাত্রায়। গভীরতর ব্যঞ্জনায় পারিপার্শ্বিক সমস্যাকে ছুঁয়ে দেন এই কবি –

সুপক্ক রক্তিম ফল ঠোঁটে বিঁধে হেঁটে গেলে,
যেন এক রূপসীকে ছিঁড়ে খায় অতিশয় কদর্য শুয়োর
শৃগালেরা উড়ে যায় হামাগুড়ি গাছ তার
পাতার আড়ালে,
সাদা খুলি শকুনের ডিম, আর নখ দিয়ে
সময়কে রেখে দেয় কুণ্ডলিত লেজের ভিতর
কুকুর লুকিয়ে।

(শবাধারে রাত)

এই চিত্রকল্পে পাওয়া যায় এক ভয়াবহ সময়ের উল্লেখ। কাক, শৃগাল, শকুন, কুকুর, রূপসীর হত্যা সময় ও সমাজের সংকটকেই প্রতীকায়িত পরোক্ষে। প্রত্যক্ষ সামাজিক সংকটের ছবি যেন হঠাৎ-হঠাৎই উঠে আসে তাঁর কবিতায় –

একটি মৃত্যু পাঁচটি লাস অসংখ্য কবর
পাঁচটি কবর অসংখ্য মৃত্যু একটি লাশ
অসংখ্য লাশে একটি কবর পাঁচটি মৃত্যু
মৃত্যু
লাশ
কবর
মানুষ—খাদ্য ও খবর।

(নামতা)

প্রতীক, প্রতিমা, ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণের সাহায্যে কবিতায় আজীজুল হক ব্যক্তিক ও পারিপার্শ্বিক সংকটকে এমনভাবে মূর্ত করে তোলেন, যা তাঁকে পঞ্চাশের অন্যান্য কবির থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। যেহেতু প্রতীক–প্রতিমার সাহায্যে কবিতায় তিনি সংকটকে গেঁথে তোলেন, ফলে তাঁর কবিতা সমকালকে অতিক্রম করে প্রসারিত হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আজীজুল হকের প্রায় অধিকাংশ কবিতা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে উনসত্তরের সময়-পর্বের উত্তাপ, বিক্ষোভ, ঘৃণা ও উজ্জীবন। কিন্তু যেহেতু ঘটনার বিবরণে তা সীমাবদ্ধ নয়, ফলে এখনো কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনায় শিহরিত হয়ে ওঠে পাঠকের মন। বলা যায়, কবিতাকে স্মরণযোগ্য করে তুলবার জন্য কবিতা-নির্মাণের আঙ্গিকগত পদ্ধতিগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। প্রতীক প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পরাবাস্তব ভাষা-সৃষ্টিতেও বিস্ময়কর কল্পনা–প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। আর এই কল্পনাতেও ছিল বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বোত্তরণের সূক্ষ্ম–ভাবনা, যার সূত্রে পৌঁছে যান আধুনিকতাবাদ থেকে আধুনিকোত্তর বোধে—

ঘড়ির ডায়ালে দুই কাঁটা
ক্রমান্বয়ে দীর্ঘতর স্থূলতর হয়ে

ঘড়ি থেকে বেরিয়েই বসলে টেবিলে
এক বিরাট শকুন
তারপর উড়ে গেল কোথায় ওদিকে।

এই কাব্যাংশটুকু পরাবাস্তব হলেও অর্থের দীপ্তিতে সমান উজ্জ্বল। ঘড়ির শকুনে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে যেমন ধরা আছে সমকালীন সংকটের চেহারা, তেমনি এর উড়ে যাওয়ার মধ্যে আভাসিত হয়ে আছে সংকট-মুক্তির ইঙ্গিত।

শামসুর রাহমানের মতোই দেশ-চেতনা এবং ব্যক্তিক-প্রসঙ্গের সংমিশ্রণে মানবিক আত্মজৈবনিক ধারাকে ষাটের সময়পর্বে অন্য যে কবি সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন তিনি হাসান হাফিজুর রহমান। পঞ্চাশের দশকে তিনিই ছিলেন দায়বদ্ধ মানবিক কাব্যধারার প্রধান কবিপুরুষ। সমাজ, মানুষ ও শিল্পকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একসূত্রে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু এই পর্বে ভাষা-আন্দোলন ও কালো দশকের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর কবিতাবলিতে যুগপৎ ফুটে উঠল জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, ভাষা সংরক্ষণের বোধ, রাজনৈতিক ঐক্যহীনতা, স্বপ্ন-ঘৃণা-পরাজয়, আত্মসংকট, স্থবিরতায় তীব্র সংগ্রামের ছবি। কালো দশকের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার সূত্রে ষাটের প্রথমার্ধে তাঁর কবিতা যেমন নিমজ্জিত হয়েছিল তীব্র নেতিবোধে, তেমনি দ্বিতীয়ার্ধে সংহত, ঋজু, অস্তিবোধে উদ্ভাসিত হয় তাঁর কবিতাবলি। হাসান হাফিজুর রহমানের কবি-চৈতন্যের দুই প্রান্তে স্থাপিত হতে পারে 'অন্তিম শরের মতো' এবং 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' নামক এই পর্বে রচিত দু'টি কাব্যগ্রন্থ।

প্রথম স্তরে জাতীয়তবাদের পরাজয়, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির স্ফীতি এবং কালো দশকের সর্বগ্রাসী বিস্তার কবির মনে জন্ম দিয়েছে আত্মসংকটের। তাঁর মনে হয়েছে 'নষ্ট এক সময়ের জালে' বন্দী তিনি, সমকালীন সময়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা মানবতা যেন –

আমি ব্যথিত পূর্ব বাঙলার ঈপ্সিত আলেখ্যের
চৌচির প্রতিলিপি ; মুখ থুবড়ে থাকা মানবতা
উদ্বাস্তু প্রগতির ধৃতরাষ্ট্র রাহু বেষ্টনে।
(জীবনের ঘন্টারোল, অ.শ.ম)

আত্মসংকটের যে পরিচয় এখানে বিধৃত আছে তার সঙ্গে প্রবল ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে

আছে স্বদেশের সমকালান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের বহুধা বিক্ষোভ।

বলা যায়, তাঁর ব্যক্তিকে জীবনবোধ ও সমাজমনস্কতা হাসান হাফিজুর রহমানকে স্বকাল ও সমাজ-ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে অনন্যতা দান করেছে। তাঁর কবিতায় জীবন এক কেন্দ্রীয় প্রতিভাস। বস্তুত তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, হতাশা এবং ক্রোধ, উত্তেজনা এবং ক্লান্তি সমাজ ও স্বদেশ-ব্যক্তিকতা থেকে উৎসারিত। "দেশজ বোধ ও সময়-বোধে তিনি উন্মথিত, অস্থির; সেজন্যেই অবক্ষয়ের করুণ আর্তির বদলে মানবিক কিংবা বস্তুগত সম্পর্কের যন্ত্রণা তাঁর কবিতার পরতে পরতে লুকানো - দেশ তাঁর রক্তে গান করে, সময় তাঁকে ভাবতে শেখায়, সেজন্যে তাঁর স্বপ্ন কিংবা জীবনতৃষ্ণা প্রগতি বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে, তাই তিনি বক্তব্য ছেঁকে তোলেন লৌকিক জীবনযাত্রা থেকে। জীবনের বাস্তবে তাঁর কবি-মানুষের শেকড়, সেজন্যে বিষয় নির্বাচনের নৈর্ব্যক্তিক বিস্তার তাঁর অন্যতম স্বাদ। জীবন এবং জীবনের চাপ তাঁর কবিতার রূপ গড়ে তোলে। কবিতাকে তিনি এভাবে ব্যবহার করে বক্তব্যনিষ্ঠ করে তোলেন তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা-বেদনা-সংহতি নয়, সামাজিক সার্থকতা, নৈর্ব্যক্তিকতা বিশাল সততার মধ্যে তিনি বিষয় ও বিষয়রূপকে গ্রথিত করে অগ্রসর হন, তাই আবেগ তাঁর কাছে ভাবের উন্মাদনা নয়, কবিতার বিষয়ধৃত বাস্তব, প্রাত্যহিক জীবনের প্রচণ্ড অভিঘাত।[৩০]

পরবর্তী গ্রন্থ 'যখন উদ্যত সঙ্গীন' ভরে আছে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মৌল অনুভবে। কিন্তু প্রথম দিকে কবির মনে হয় নাগরিক জীবনে অর্থাৎ 'শহুরে পাটাতনে রুটিনের অমোঘ ছকে' বাঁধা পড়বার ফলে স্বদেশকে চিনতে পারননি তিনি। শুরু হয় আত্মবিশ্লেষণ ও শিকড়ের সন্ধান এবং এর পরেই অস্তিত্ববোধে উত্তরণ ঘটে তাঁর কবিচৈতন্যের। শামসুর রাহমানের মতোই মাতৃভাষা, স্বদেশানুরাগ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের তীব্র জটিল রক্তক্ষত-চিহ্নিত পথ বেয়ে সার্বিক মুক্তি ঘটে তাঁর।

আশ্চর্য সুগন্ধ মুক্তি আসে ভেসে হাওয়ার আভাসে,
নবান্নের মদির ঘ্রাণের চেয়েও প্রাণজয়ী মনোহর।
যেন বা রূপকথার অভিশপ্ত রাজপুত্র আমরা সবাই
একে একে আবিল খোলস খুলে

---

৩০. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, *হাসান হাফিজুর রহমান*, পৃ. ২০

অজগর শরীর থেকে দিব্য দেহে ফিরে যাই।

(অবশেষে এল কি সময়)

যখন স্বাধীনতা অর্জিত হলো তখনি কবির কণ্ঠে বেজে উঠেছিল এই প্রগাঢ় উক্তি। বস্তুত তাঁর কবিতার স্বধর্ম বা চারিত্র্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাঁর কবিতার বিকাশ ধারা। ভাষার যে দ্যুতি ছড়ানো ছিলো পঞ্চাশের দশকে রচিত তাঁর কবিতাবলিতে - এই পর্বে সেই ধারাবাহিকতা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। প্রতীক, প্রতিমা, ইঙ্গিতময়তার পরিবর্তে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে কবিতার প্রধান অংশ জুড়ে থেকেছে মসৃণ বিবরণধর্মী পঙক্তিমালা। ভাষাশৈলীর দিক থেকে বলা যায়, পঞ্চাশের দশকের তুলনায় কোনো উত্তরণ ঘটেনি। এই পর্বে তিনি গদ্যছন্দে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে অলংকার প্রয়োগে শিল্পচাতুর্য প্রণিধানযোগ্য —

উপমা :

১. কিশোর চোখে রঙিন বেলুনের মতো
কতিপয় সন্ধ্যার আকাশ চরম লোভনীয় হয়ে উঠেছিলো।

২ যদ্দুর দেখা যায়
ডালির ঘড়ির মতো
বিগলিত ধ্বংস অচল স্থির হয়ে আছে।

বাক প্রতিমা :

পৃথিবীতে এত পাতা ঝরে, এত স্রোত নদী ও নালাতে
তবু শব্দ কই শব্দ কই বলে শয্যা ছেড়ে ছটফট
উঠি মধ্যরাতে কখনো বা আকুল দু'হাতে
দেয়াল হাতড়ে বলি পথ দাও, পথ দাও, পথ দাও, যাবো
নরম জ্যোছনার ঘরে, যাবো দারুণ রৌদ্রের কলস্বরে,
যতদূর ইচ্ছা হয় যাবো দূরে দূরান্তরে।

(আমার ভেতরের বাঘ/আ.ভে.বা.)

সমকালে হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার স্রোত এক মোহনীয় মোহনায় উপনীত। তাঁর কাব্য-কুশলতা ও আঙ্গিক নির্মাণের উপর্যুপরি সচেতনতা যেমন কবিতাকে

নবমূল্যায়নে সহায়তা করেছে তেমনি সমাজ-সংলগ্ন উচ্চারণ ও প্রকল্পনা তাঁকে ক্রমাগত কাব্যপ্রেমীদের আত্মার আত্মীয়ে পরিণত করেছে।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কাব্য-বিশ্বাসে যেমন সমাজ-সংলগ্ন তেমনি কবিতার মেজাজ ও আয়োজনে, প্রতিন্যাস ও প্রতিতুলনায় চিত্রকল্প ও শব্দবিন্যাসে আতীব্র রোমান্টিকতার অভিসারী। বাস্তবতার অনুরাগ ও সৌন্দর্যলিপ্সার সম-আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি কবিতা নির্মাণে এ দুইয়ের প্রতি যত্নশীল ; অর্থাৎ আধার ও আধেয়কে তিনি সমান গুরুত্বপূর্ণ মানেন। বস্তুত হৃদয়বাদী কাব্যধারার তীর্থযাত্রী হিসেবেই তিনি সবিশেষ গৌরবদীপ্ত ; ফলে লৌকিক আচার ও লক্ষণে এবং লিরিক-প্রিয় প্রবণতায় তাঁর কবিতা ক্রম-উদ্দীপিত, উত্তরণধর্মী ও ক্রম-প্রসারমান। বলা যায়, তিনি যে মানুষ ও মানব-আর্তিকে কবিতায় প্রার্থনা করেছেন, যে শৈল্পিক চাতুর্যে নির্ণয় করেছেন যাদের অস্তিত্ব - তারা দেশ, সময় ও প্রতিবেশেই সম্পৃক্ত ; আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়নে বিপর্যস্ত, বিদ্রোহে অক্লান্ত মানুষ। ফলে রাজনীতি ও সমাজ-সজাগতার চিত্র প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে তার কবিতায় -

আমি যখন নগরীতে এলাম
তখন সময় খুব বিশৃঙ্খল, চতুর্দিকে ক্ষুধা।
আমি যখন মানুষের কাছে গেলাম
তখন বিদ্রোহের কাল, তারা, আমি
সকলেই বিদ্রোহী।
পৃথিবীতে আমার দিন এবং রাতগুলি
এভাবেই কেটে গেল।

(আমার উত্তরপুরুষকে, স.প্র.)

একুশের ভাষা-আন্দোলন আমাদের জাতীয় সত্তা ও চেতনার সংবেদনশীল প্রতিফলন উদ্ধারের একটি অনন্য উৎসার নিঃসন্দেহে। সেই একুশের বিত্ত ও ঐশ্বর্য আমাদের সাহিত্যের অন্তঃস্রোতধারা উজ্জীবন ও তীক্ষ্ণ মেধা-বিজড়িত অপরিমেয় শক্তি সঞ্চার করেছিলো। বস্তুত সেই শক্তির ধারাবাহিকতায় লিপ্ত থেকেই আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্য-জগতের নির্মাণ। তাঁর মানসভূমিতে যে সামাজিক ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রবহমান তিনি তাকে ঐতিহ্যমনস্ক বিভায় ও লৌকিক আধারে

পর্যবসিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর একমাত্র চিন্তার সারাৎসার দেশ ও মানুষ। ’৫২–এর ভাষা-আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে তাঁর উচ্চারণ লক্ষণীয় –

কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।
খোকা, তুই কবে আসবি ?
কবে ছুটি ?
চিঠিটা তার পকেটে ছিল
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

(মাগো ওরা বলে, কমলের চোখ)

নির্মাণ ও প্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তাঁর উদ্দীপনা ব্যতিক্রমী। লৌকিক ছড়ার ছন্দকে তিনি ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত করেন পাঠকের সামনে। প্রতীকের আয়োজনেও তিনি অতি চেনা জগৎ থেকে তুলে আনেন তাঁর শব্দ এবং তার প্রতিবেশ –

১. মা কি শালিক পাখি ?
খয়েরি শাড়িতে তাঁর
হলুদের ছোপ
তারপর একদিন তিনি
শেফালির ফুল

(মা তুমি/২,কমলের চোখে)

২ ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়
যুদ্ধ আসে, ভালোবেসে
মায়ের ছেলেরা চলে যায়।

(মা তুমি/৩, কমলের চোখ)

কবিতায় প্রতিমা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, তুলনা-প্রতিতুলনা নির্মাণেও তিনি সিদ্ধহস্ত :

১. তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিলো।

২. উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্রের মতো
কমলের চোখের কথা বলছি।

মালোপমার ব্যবহার :

পিতামহের স্রোতের মতো
আলোকিত ব্রজের মতো
আন্দোলিত বৃক্ষের মতো
মন্দ্রিত প্লাবনের মতো
সহিষ্ণু ধরিত্রীর মতো
পবিত্র কবিতার মতো
আমরা প্রার্থনা করছি
আমরা দিন এবং রাত প্রার্থনা করছি।
(বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা, স. প্র.)

ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা, সময়ের বৈরী স্বভাব, জীবন ও সমাজমগ্নতা ও আধুনিক শিল্পধ্যান একদিকে যেমন তাঁর কবিতার ভূমিকে ঋদ্ধ করেছে তেমনি স্বরবৃত্ত ছন্দের মুক্ত উচ্চারণে আমাদের কবিতার একটি বিরল ও ওজস্বী ধারার গতিকে অধিক তীক্ষ্ম শব্দবাণে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ বেগবান করে তুলেছেন। বস্তুত পঞ্চাশের পুরো কাব্যধারায় সহজ স্ফূর্ত মসৃণ অজটিল কলাকুশলতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন তিনি প্রবল প্রতাপে।

পঞ্চাশের দশকের আরেকজন কবি সৈয়দ শামসুল হক ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে আমাদের অভিনিবেশ দাবি করেন। মনে হয় কবিতার আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষার কাজ তিনিই সবার চেয়ে বেশি করেছেন। চৌদ্দ মাত্রার পয়ারে লেখা দীর্ঘ কবিতা ‘বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা’ কিংবা কাব্য-নাটক ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ তারই প্রমাণ। এই দুটি কাব্য নব্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক সত্তার ক্রম-উদ্বোধনের ভাষ্য। কিন্তু সৈয়দ

শামসুল হক বিষয় থেকে শিল্পের নির্যাস এমন কুশলী হাতে নিঙড়ে নেন যে তাঁর কবিতায় বিষয়োত্তর মহিমার স্বাদ জড়িয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত।[৩১]

আত্মগত প্রসঙ্গ, আত্মজৈবনিকতার সূত্রে সমকালীন সময় এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ যথাক্রমে উপজীব্য হয়ে উঠেছে—'বিরতিহীন উৎসব', 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' এবং 'প্রতিধ্বনিগণ' নামক তিনটি কাব্য সংকলনে। আত্মগত বিষয় কবিতার প্রসঙ্গ হয়ে ওঠায় বিরতিহীন উৎসব এবং পঞ্চাশের দশকে রচিত 'একদা এক রাজ্যে' কবিতাগুলির মধ্যে বহিরাবরণে কোনো উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় না। তবে 'বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা' বিষয়-বৈচিত্র্যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আত্মজৈবনিক স্মৃতিচারণমূলক ভঙ্গিতে রচিত একটিমাত্র দীর্ঘ কবিতা সংবলিত এই রচনাটির পরতে পরতে মিশে আছে পাকিস্তান-উত্তর পূর্ববাংলা, বিশেষ করে ষাটের দশকের বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, স্ফীতকায় মধ্যবিত্তের নতুন সৃষ্ট ঢাকা শহর, নিজের সৃষ্টিশীল জীবন প্রভৃতি অনুষঙ্গ। গ্রন্থটির শুরু শৈশবের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে উঠে আসে যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা –

ইষ্টিশানে আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম
চলে গেছে বেলা তিনটার গাড়ি
দূরে রঙিন রুমাল লাল শিমুলের গাছে।

কিন্তু পিতার মৃত্যুতে জীবনে কখন যেন ঘনিয়ে ওঠে সংকট : 'পিতাকে যখন দেখি নত সেজদায়, কাফনের ঘ্রাণ পাই'। অথচ এই পিতার আকাঙ্ক্ষা চিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির —

অনুপম সান্তি সমর্পণে বলতেন পিতা
একসাথে থাকিস বাছারা।

কিন্তু আজ ঔপনিবেশিক শাসনের কূটচালে অথবা পাকিস্তানি রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন, ধ্বস্ত, মানুষের মন। সামাজিক, রাজনৈতিক বিকাশও অসংগতিপূর্ণ, কালো দশকের আবির্ভাবে 'অক্টোবরে কাঁদে দেশ'। ভদ্রাসন বিক্রি করে ভাই। মন্ত্রীরা

৩১. *কথা ও কবিতা*, পৃ. ১৪০

শপথ নেয় গাঢ়স্বরে দরবার ঘরে – 'আমার সন্তান যেন বাঙলার শ্মশানে থাকে দুধে ভাতে'। বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীও অসঙ্গতিতে আক্রান্ত, কারো কারো বাড়ি গাড়ি হয়। আমেরিকা ইউরোপ ছোটে ছাত্র, অধ্যাপক. ছাপা হয় ছবি, ইলিশের গন্ধে আজো ডুবে যায় কত ঝাঁঝালো বিক্ষোভ, অশ্রু, দুঃখ, পরাজয়। আর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিদিন পাজামার ছাঁট বদলায়, উদ্যাপিত হয় জন্ম রবীন্দ্রনাথের, পৈতৃক তন্দুরে সেঁকে আবদুল্লাহ রুটি'। ঢাকা শহর বেড়ে উঠছে দ্রুতগতিতে। গ্রামজীবনের সঙ্গে নাগরিক জীবনের যেন তৈরি হতে চলেছে এক ধরনের সংঘাত। কিন্তু কিছুদিন আগেও এমন ছিলো না। কবি তাঁর 'নীল সুটকেসে' বহন করে এনেছিলেন 'কুড়িগ্রাম' থেকে তার ক্রুদ্ধ ধরলার একটি কল্লোল, আর আকন্দের পাতা আর শ্যামলের ছবি'। কিন্তু এখন নাগরিকতার চাপে সরে যাচ্ছে সেই অনুভব, জেগে উঠছে বিষাদ। কেননা "পংক্তিমালার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেই বাংলাদেশ — যা একদিকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ, ছেচল্লিশের দাঙ্গা আর স্বাধীনতার স্মৃতি ভারাক্রান্ত, অন্যদিকে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও ঔপনিবেশিক নিপীড়নের টানাপোড়েনে রুদ্ধশ্বাস। চলচ্চিত্রের মতো ছবির পর ছবি সাজিয়ে কবি তাকে ধরে রেখেছেন চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ পয়ারে। মধ্যবিত্ত মানুষ, উদ্বাস্তু মানুষ, বিভ্রান্ত মানুষের ছবি 'পংক্তিমালা'। এসবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণার গরলে নীলকণ্ঠ কবি দেখেছেন পুরোনো মূল্যবোধের বিনষ্টি, নতুন মধ্যবিত্তের উচ্চাশা—কলাকৈবল্যবাদের পতন। কাব্যের প্রথমে প্রায় আদি কবির মতোই সৈয়দ হকের জিজ্ঞাসা ; তাহলে একে কি বলি? এই যা লিখেছি। শোকগ্রস্ত জননীর মতো? এবং এই প্রশ্নের পৌনঃপুনিক অভিঘাতে পংক্তিমালার মর্মমূল উচ্চকিত। কবিতা কি আপন ভাষণ নাকি বিবেকের কণ্ঠ, অবিনাশী সখা? এই জিজ্ঞাসার পটভূমিতেই ক্রমশ তিনি বুনে তুলেছেন তাঁর স্মৃতি-স্বপ্ন-প্রত্যাশা মদির বাংলাদেশের চিত্রনাট্য।[৩২] কাব্যের অন্তিম স্তবকে সৈয়দ হকের প্রার্থনা ছিলো :

আবার উঠবো জেগে খর চৈত্রে চর
হয়ে তোমার পদ্মায়। পিঙ্গল জটায়
স্রোতের প্রপাত নিয়ে হেঁটে যাবো আমি
স্মৃতির বাসরে জন্মে জন্মে বার বার
কবি হয়ে ফিরে আসবো আমি বাঙলায়।

---

৩২ ঐ, পৃ. ১৪৭

কিন্তু তখন কি তিনি জানতেন কোন বাংলায় তাঁকে ফিরে আসতে হবে? অবশ্য 'পংক্তিমালা'য় ইতস্তত তার সংকেত ছিলো। বাংলাদেশের তৎকালীন ক্ষোভ, ব্যর্থতা ও সংগ্রামের কথা এই কাব্যের নেপথ্যে ধ্বনিত হয়েছে একটানা। "একজন কবি যিনি অতীত ও বর্তমানে বেঁচে থাকেন – ভবিষ্যতে নিজেকে সম্প্রসারিত করে দেন, তিনি দাঁড়াবেন কোথায়? সৈয়দ হক সচেতনভাবেই একাব্যে বাঙলা কবিতার আদি ছন্দ চৌদ্দ মাত্রার পয়ারকে বেছে নিয়েছিলেন। অবিশ্রান্ত জল-কল্লোলের মতো এই পয়ার মধুসূদনের বহমানতা, রবীন্দ্রনাথের সংগীতময়তাকে আত্মসাৎ করে শাশ্বত ও আধুনিক চৈতন্যের সেতুবন্ধ রচনায় সিদ্ধি লাভ করেছে, সন্দেহ নেই। পুরোনো আঙ্গিকের এই নতুন উজ্জীবনের ভেতর যেন কবির পরবর্তী পরিণামেরই প্রতীকী আভাস।"[৩৩] বলা যায়, পরিণামে 'পায়ের আওয়াজ'-এর আঙ্গিকে যে ঐশ্বর্যের দ্যুতি জিকিয়ে উটেছে বাংলাদেশের কাব্যে তা তুলনারহিত। বনেদি অক্ষরবৃত্তের শরীরে দেশজ অভিব্যক্তির রঙ ফলিয়েছেন তিনি, ঘরোয়া ছড়ার ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন কবিগান ও কথকতার ধারা। পীর-বাবার সংলাপে সেই কথকতা লীন হয়ে গেছে গ্রামীণ মিলাদ মহফিলের আবহে। এইসব ক্ষেত্রে উপমার চমৎকারিত্ব ও মৌলিকত্ব লক্ষণীয় :

কি হইলো এতগুলো জুয়ান-মরদ?
শিঙ তুইলা ছুইটা আসলে পাগলা বলদ
একাই সামাল দিছ, ডর করছ না;
যখন উঠছে খলখলায়া যমুনা
জিনে ধরা যুবতীর লম্বা কালা ক্যাশের লাহান
চৈতের ঝড়ের ঝুঁটি ধইরা দিছ টান
ফিরা আইসছো ঘরে।

আর আজ লোক নাই এতগুলো লোকের ভিতর?

গোঁয়ার বলদ অথবা যুবতী নারীকে শাসনের উপমান মাতবরের সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে চমৎকার সংগতিপূর্ণ। লোক-সংস্কৃতির উপাদানের সঙ্গে আধুনিক চেতনার সমন্বয়ে 'পায়ের আওয়াজ' এক ভিন্ন স্বাদের কাব্য। মানতেই হয় যে, 'পংক্তিমালা' থেকে 'পায়ের আওয়াজ' পর্ব পর্যন্ত সৈয়দ হকের সৃষ্টিশীলতার এক নতুন ও পেশল নিরীক্ষা শক্তি-সঞ্চারে সহায়ক হয়েছে।

---

৩৩. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৮

পঞ্চাশের অন্যতম কবি আল মাহমুদ স্বদেশ–চেতনা ও স্বকাল নিঃসরিত হৃদয়–অনুভবকে আলিঙ্গন করে কাব্যযাত্রা শুরু করেন। শামসুর রাহমানের কবিতায় যেমন আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিক অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছিল, তেমনি ওই একই মনোভঙ্গির অনুসরণে আল মাহমুদের কবিতায় অন্যদিকে উপজীব্য হয়ে উঠেছে গ্রামীণ অনুষঙ্গ। কাব্যযাত্রার প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ কালো দশকের প্রাথমিক স্তরে তিনি ছিলেন আত্মসংকট এবং নেতি চেতনায় আমূল নিমজ্জিত; আর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ কালো দশকের শেষ দিক থেকে তিনি ক্রমশ উত্তীর্ণ হয়েছেন স্বাদেশিক বোধে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' (১৯৬৩)–এ ব্যক্তির নৈরাশ্য, ক্রোধ, ক্ষোভ বিচ্ছিন্নতাবোধ, শূন্যতা এবং বেদনার আর্তি প্রতিফলিত হলেও শেষাবধি জীবন ও পৃথিবীর টানে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, 'শিশু আর পশুর বিরোধ'–এ তিনি সঙ্গীহীন, জর্জরিত, উদ্বেল–আকূতিতে পরম্পরাহীন। নৈরাশ্যের পীড়ন উপেক্ষা করেও শেষাবধি স্বদেশ ও গ্রামজীবনকে আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তিতাস ও তিতাস বাহিত প্রকৃতি ও জনজীবনের উত্তাপ ও বৈভবকে স্থাপিত করেছেন বাংলাদেশের সমগ্রতায়—এই সমগ্রতাই আল মাহমুদের উত্তরণের বীজ –

কেন যে আসতে চাও। এ যে বড়ো ভয়ানক দিন,
চালের লতানো ফুল মরে যাবে বৃষ্টির অভাবে,
দুঃখের চৌকাঠ ভেঙে যদি আসো, দাঁড়াবে কিভাবে?
এখানে যৌবন দ্যাখো, কাঁটা ঘাসে এমন মলিন!
বাতাসে বিশ্বাস নেই, আঙ্গিনার ধবল পাথরে
আগুন ঠিকরে ওঠে, বুঝি এ–ই দুঃসহ দোজখ!
তবু যে আসতে চাও, বুঝি না তো এ কেমন সখ
তোমাকে সাহস দেয় দেহ দিতে আমার বাসরে।
নির্জল নির্দয় দেশে পেটে নেবে আমার সন্তান—
আঙ্গিনায় রক্ত ঢেলে বসন্তকে ফেরাবে কি নারী
জলের প্রার্থনা ছেড়ে আকাশে তুলবে তরবারি?
মানবে না তুমি বলো নিয়তির নিরুপম গান।
তাই হোক! তুমি এসো কোমরে পেঁচিয়ে নীল শাড়ি
দুঃখের ঘরকে শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান।

কবিতাটির প্রথম পঙক্তিতেই এক অদ্বিতীয় বিশেষণ 'বড়ো ভয়ানক দিন' এবং পরের পঙক্তিতে 'চালের লতানো ফুল মরে যাবে বৃষ্টির অভাবে'— লক্ষণীয় কবিতাটি রচিত হয়েছে সেই পটভূমিতে যখন আইয়ুবী সামরিক শাসনে জনজীবন শ্বাসরুদ্ধকর — এই পরিবেশ যে কোনো শিল্পের জন্যেও অস্বাস্থ্যকর, যে কারণে চালের লতানো ফুল মরে যায় বৃষ্টির অভাবে। প্রতীকে ও ব্যঞ্জনায় মূলত সেই সময়-সংক্রান্তির কথাই বলা হয়েছে এখানে। বস্তুত আল মাহমুদের ব্যক্তি-চেতনা স্বদেশ-চেতনারই সমান্তরাল, তিনি ব্যক্তির অফুরন্ত অগ্নি প্রোজ্জ্বলনে দেশকাল-সমাজকেই বিভিন্ন বহুবর্ণিল চেতনা-সংক্রামে রণিত ধ্বনিত করেছেন। তাঁর কবিতার স্বদেশ-চেতনা ও কাল-যুগ-যন্ত্রণার মন্থন একই প্রতিসাম্যে উপজীব্য হয়ে উঠেছে —

একটু উত্তাপ নেই কারো মুখে, কোনো উচ্চারণ
পবিত্র করে না এই নির্বান্ধব প্রকোষ্ঠের কারা?
অথচ ঘটবে কিছু, যা ঘটার বিভিন্ন কারণ
উপস্থিত পড়ে আছে এলোমেলো, শুধু নেই তারা
যাদের বিহনে এই অন্ধকার স্বরূপ ধারণ
করে আছে চরাচরে। ঘরে ফেরে ভয়ের ছায়ারা।

(লোকালয়)

'সোনালি কাবিন' লৌকিক জীবনের যে হার্দ্য-করুণ-ভূমির উপর স্থাপিত—তারই বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে যাদের অধিবাস সেই কৃষকদের প্রাণবন্ত জীবন-সংগ্রাম উঠে আসে এই উচ্চারণে —

নদীর সিকস্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে মধ্যরাতে কেউ
যেমন শুনতে পেলে অকস্মাৎ জলের জোয়ার,
হাতড়ে তালাশ করে সঙ্গিনীকে, আছে কি না সেও
যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার —

একটি জনগোষ্ঠীর মানস-প্রতিবেশ, প্রেম ও দ্রোহ, ক্ষোভ ও সংরাগ তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। বাংলা-ভাষী জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম, প্রাকৃতিক ও সামাজিক রাজনৈতিক বৈরিতা ও সংদমনের বিরুদ্ধে তার দ্রোহ - সব কিছুই চেতনার

গভীরে মিশে থাকে। বাধ্য হয়ে বাধা পেলে উশকে ওঠে সে আগুন; তখন সে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার অধিকার। সেই অর্থে 'সোনালি কাবিন' বাঙালি সংগ্রামী মানসের বিশ্বস্ত উচ্চারণ। বাঙালির চিরায়ত সংগ্রামের সঙ্গে আল মাহমুদ অবশ্য বৈশ্বিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অতিরিক্ত মাত্রাও যোগ করেছেন :

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েন সাঙের দেশে শান্তি নামে দ্যাখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।

সাম্যবাদী চেতনার প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত ঘোষিত হয় এভাবে। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা : "ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় কবির অসহায়তা ও জীবিকার অনিশ্চয়তা অন্যান্য কবির মতো আমাকেও কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াতে দেয়নি। আর আমি তো জন্মেছি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশে। কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে এর প্রতিকার চিন্তায়।"[৩৪] এই প্রতিকার প্রক্রিয়াটি যেহেতু কখনোই সম্পন্ন হয় না, ফলে দেশের প্রতি অনুরাগ ও তার সংকটে সমানভাবে কেঁপে ওঠেন তিনি। সফলতার বোধও তাঁকে উদ্দীপ্ত করে তোলে অনেক সময়, ফলে সাম্যবাদী চেতনার প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত ঘোষিত না হয়ে পারে না।

আল মাহমুদের কবিতার অন্যতম সম্পদ এর শব্দসম্ভার। তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে লোকজ এবং মুসলিম জীবনের অন্তরঙ্গ শব্দরাজির সহাবস্থান ঘটেছে তার অধিকাংশ কবিতায়। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যখন যুক্ত হলো আঞ্চলিক ভাষারীতির ধরন তখন তাঁর কবিতা শুধু অভিনবই হয়ে ওঠেনি, বাংলা কবিতায় আধুনিকতাকে তিরিশি কবিতার পর কিছুটা প্রসারিত করেছিলেন তিনি। এ সম্পর্কে আল মাহমুদ নিজেই বলেছেন : "আমি আমার কবিতার জন্য একটি পছন্দমত ভাষাভঙ্গি উদ্ভাবন করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। অকস্মাৎ আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাঙলা ভাষার সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দরাজি বহু বিচিত্র ব্যবহারে ও যথেচ্ছ আচরণে তিরিশ দশকেই বিস্বাদ, এমনকি পরবর্তী কবিদের জন্য গন্ধহীন পুষ্পের পচা স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখন বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন

৩৪. আল মাহমুদ. *আল মাহমুদের কবিতা*, ভূমিকা, পৃ. ৬

ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের যে অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে সেখান থেকে ব্যাপক ভাবে শব্দ আহরণ করে সাহিত্য রচনা করতে না পারলে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একঘেয়েমি কাটবে না। এই আহরণ নির্বিচার হলে চলবে না। প্রতিভাবান কবি ও কথাশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি সেখানে একান্ত দরকার। অনেকে আমার কথা শুনে তাদের সামগ্রিক রচনা শৈলীকেই আঞ্চলিক ভাষায় দাঁড় করাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। মনে রাখতে হবে আধুনিক বাঙলা ভাষার চলতি কাঠামোকে পরিত্যাগ করে নয় বরং এই কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক শব্দের কাব্যময় প্রয়োগকে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ভাষা লাফিয়ে উঠবে সমুদ্র তরঙ্গের মতো।”[৩৫] আল মাহমুদের কবিতাও যে এভাবেই তাঁর বক্তব্য অনুসারে নতুন ভাষারীতি ব্যবহারে সচকিত হয়ে উঠেছিল, তা তাঁর অধিকাংশ কবিতার ক্ষেত্রেই এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

অসংখ্য চক্ষু যেন ঘিরে ফেলবে এখুনি আমাকে
শস্যের সবুজ থেকে ক্রমাগত উঠে আসে গোসার গোঙানি
কারোগেটে ঢেউ তুলে চাবকে দেবে আমাকে নির্মম।
তন্ন তন্ন করে দেখে নেবে বাসন-কোসন
পুথিপত্র ছারখার ছড়িয়ে চৌদিকে
শিকার পাইলা খুলে দেখবে নেই, ভাত বা সালুন।
(আমিও রাস্তায়, সোনালি কাবিন)

সনেটের আঙ্গিকে রচিত ‘সোনালি কাবিন’ কবিতায় উপমা, রূপক এবং শ্লেষোক্তির গ্রন্থনায় গড়ে উঠেছে সার্থক বাকপ্রতিমা —

হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার
এবার গুটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে,
প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার
তারও চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে।

অনুপ্রাসের ব্যাপক ব্যবহার ভাষাভঙ্গিকে করেছে শ্রুতিমধুর —

১. পূর্ব পুরুষেরা ছিলো পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব

---

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

২. তোমার শরীরে যদি থাকে শস্যের সুবাস,

৩. বাঙালী কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী,

অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত এবং গদ্যছন্দকে তিনি সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কবিতার ধারা স্রোতে তিনি জাগিয়েছেন নিজেকে স্বকাল ও সমকালের জগৎ ও জীবনকে।

পঞ্চাশের অপর এক কবি ফজল শাহাবুদ্দীনের কাব্যচর্চা শুরু হয়েছিলো ভিন্ন পথে। নারী ও প্রকৃতির যৌথ উপচারে তিনি তাঁর কাব্যের ডালা সাজিয়েছিলেন। বস্তুত, নারীর জন্যে পুরুষের এবং পুরুষের জন্য নারীর শরীর স্পর্শের যে আকাঙ্ক্ষা জাগে, সেই আকাঙ্ক্ষার 'অতৃপ্ত তরঙ্গে একা' 'মোহাবিষ্ট' হয়ে বিরতিহীন ভাবে তিনি রচনা করে গিয়েছেন কবিতার পর কবিতা। বিষয়-বৈচিত্র্য খুব বেশি না থাকলেও তাঁর বেশ কিছু কবিতায় লক্ষ্য করা যায় মানুষ, প্রকৃতি, দেশ-চেতনা বা আন্তরিকতার ইশারা। প্রকৃতির উল্লেখে নিসর্গের পটে মানুষের চলমান জীবন-সংসারকে দেখতে চেয়েছেন কখনো কখনো। স্বদেশ চেতনার ক্ষেত্রেও দেশের সংগ্রামী মানুষের চাইতে এর নিসর্গ-মৃত্তিকার প্রতিই কবির আগ্রহ লক্ষ্য করা যাবে বেশি। নাগরিকতার প্রতি তাঁর বিপন্ন বোধ প্রতিফলিত হয় এভাবে :

হামাগুড়ি দিতে হয় দুপুরের তৃষ্ণার্ত গলিতে ...
বিহ্বল চৈতন্যে আসে সন্তর্পণে কুকুরের দীর্ণ
ক্লান্তি। আমের গলিত খোসা, মাছ, কীট, ফেরিঅলা
ছড়ানো নগর পথে—বায়ু দিগ্‌ভ্রান্ত যেন কোনো
উন্মাদ উদ্বাস্তু নৃত্যে দিগম্বর গ্রীষ্মের দুপুরে।

(দুপুরের কথা)

দুপুরের এই বর্ণনায় কবির অস্তিত্বের বিপন্নতা, সভ্যতার প্রতি ঘৃণা, এমনকি আত্মরতিমূলক নির্বিকার বোধও পরিলক্ষিত হয়। বিংশ শতাব্দীর বণিক-সভ্যতার আলোকে বিভ্রান্ত দিশেহারা কবি-চৈতন্যের উচ্চারণ মানুষের নিষ্ঠুরতার বলয়ে উপস্থিত হয় এভাবে :

হে আমার অস্তিত্ব আমাদের আজ অন্ধকার দাও
কেননা এই বিংশ শতাব্দীর সুতীব্র আলোকে

আমরা আজ বিভ্রান্ত দিশেহারা এই যান্ত্রিক উজ্জ্বল
বিবিক্তি মত্ত নগ্নতার চাবুকে —
আমরা আজ ছিন্নভিন্ন
আমরা শঙ্কিত নিজেদের নিষ্ঠুর নিঃস্বতায়।

বলাবাহুল্য, এরকম পরিস্থিতিতে কবি-চৈতন্য আক্রান্ত হয়ে পড়বে আত্মরতিতে : "আমি মগ্ন তৃষ্ণার অগ্নিতে মগ্ন/অলৌকিক নিজেরি কুহকে।" সমসাময়িক দ্বন্দ্ব-সংক্ষোভ, ঘাত-প্রতিঘাতময় সময় থেকে ব্যক্তির প্রতিযোগিতার দৌড় থেকে নিজেকে আড়াল করেছেন দেহ-চেতনায়। এক্ষেত্রে তিনি সৈয়দ আলী আহসান, বিশেষত, সৈয়দ শামসুল হকের অনুসারী। সৈয়দ আলী আহসানের মতো যদিও পরিশীলিত নয় তাঁর দেহ-ভাবনা বরং তা অনেক বেশি বাস্তব, সজীব, জান্তব এবং প্রত্যক্ষ। আর এটাই হচ্ছে তাঁর কবিতায় আধুনিকতার একটা দিক। আর একটা দিক হলো তাঁর ভাষাভঙ্গি। ছোট ছোট লিরিকে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্য-জগৎ, পুরে দিয়েছেন তাঁর অনুভব, চেতনাকে। জটিলতা স্থান পায়নি এবং ভাষা অলংকারের বাহুল্যে তা ভারাক্রান্ত নয়। মাঝে-মধ্যে অনুপ্রাসের ঝংকার লক্ষণীয় :

হে আমার বাঙলা ভাষা, মা আমার
তোমার কাছে আমি আমৃত্যু অনন্তকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।
(বাঙলা ভাষা মা আমার)

চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে চরণান্তিক মিল দিয়ে এক ভিন্ন স্বাদ এনেছেন তিনি 'অস্থিতে মজ্জায় তুমি/ছিলে চিরকাল আমার মাংসের মধ্যে আমার কঙ্কাল। চুম্বনে নিমগ্ন একা ছিলে আলিঙ্গনে উন্মত্ত বৃষ্টির গানে শ্রাবণে-শ্রাবণে"/ (রমিত বসন্তে, যা তোমার কাছে)।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ মূলত সৃষ্টি করেছেন সনেট-পঞ্চাশের আরো অনেক কবিই এই মাধ্যমটিকে ভালোবেসেছিলেন। ব্যক্তি, দেশ, সমাজ, ঐতিহ্য—এইসব তার কবিতার বিষয়; তাঁর একটি বিশিষ্ট চেষ্টা পুথির রূপায়ণ।[৩৬] আত্মকথনের ভঙ্গিতে ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ছাড়াও সমকালীন যুগচিত্র এবং স্বদেশ-প্রেমের প্রকাশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সনেটসমগ্রে। তাঁর ১৮ মাত্রার সনেটগুলিতে অর্থ-দ্যোতনাও লক্ষ্য করা যায় :

৩৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কাফেলা, এপ্রিল*, ১৯৮১

সুন্দর বনের বাগ যাচ্ছে কমে এবং অধুনা
হাঙর কুমীর মত্ত সমুদ্রে করে না আনাগোনা
ভোলে হিংস্রতার স্বাদ, দেখি বন্য বরাহের দল
বাঁধে না আক্রোশে আর আগেকার মতন দঙ্গল।
চিত্রল হরিণ সেও লুকিয়ে গিয়েছে ঘন বনে
ভয়াল আজদাহা ধায় প্রাণ ভয়ে গভীর গহনে।
উঁচিয়ে প্রচণ্ড শুঁড় আরণ্যক হাতীও পালায়
নিধনের যজ্ঞে যেতে শিকারী চলেছে পায় পায়
চোখে তার ঈর্ষা ঘৃণা বনের বাঘের মত জ্বলে,
অরণ্যে জন্তুরা কাঁপে মানুষের কঠিন কবলে।
(সুন্দরবনের বাঘ)

আঙ্গিক–সচেতন কবি মাহফুজউল্লাহ্ ছড়ার ছন্দেও সিদ্ধহস্ত —

স্বপ্ন হে মোর নিত্যকালের সঙ্গী
শিখলে কোথায় কালের চতুর ভঙ্গি?
(স্বপ্ন হে মোর)

পঞ্চাশের অন্য এক কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কাব্যযাত্রার প্রাথমিক স্তরে রোমান্টিক চেতনায় আক্রান্ত হলেও এই পর্বের কবিতায় লক্ষ্য করা যায় এক ধরনের উত্তরণ। রোমান্টিক বোধ থেকে যদিও মুক্ত নয় তাঁর কবিতাবলি, তবু আরো বেশি সমকাল–সংলগ্ন হতে চেয়েছেন তিনি। স্বদেশ–চেতনা, ঐতিহ্য–ভাবনা এবং বহির্বিশ্বের দিকে প্রসারিত তাঁর দৃষ্টি, পূর্ববর্তী দশকের দেশাত্মবোধ তাই হয়ে উঠেছে আরো গভীর, ঐতিহ্য চেতানায় সমৃদ্ধ :

বাঙলার দুয়ার তুমি খুলে দিলে পৃথিবীর দিকে;
এবং সহস্রধার আলো এল অমেয় উজ্জ্বল
তুলনাবিহীন গানে স্পন্দমান, দ্রুত পরিমল
গন্ধবহ অচিন্ত্য–প্রতীচ্যের ঐক্যধ্যানে
নবনব উত্তরণে অনিঃশেষ সৌকর্যে সুধায়

বাঙলার ভাষাছন্দ কাব্যরীতি নব-অভিধায়
নতুন আনন্দে বেঁধে দিলে এক অতুলন জ্ঞানে।
(মধুসূদন, প্রতনু প্রত্যাশা)

বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষাকে অনুভব করবার যে আকূতি মধুসূদনে দেখা গিয়েছিলো — তেমনি মনিরুজ্জামানও এই পর্বে বিশুদ্ধ রোমান্টিকতায় সমর্পিত না থেকে স্বদেশ তথা পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। সমকালীন পৃথিবী এই সময়ে দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত। বিশ্বজুড়ে স্নায়ুযুদ্ধের চাপ। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতায় এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবীর ছবি ফুটে উঠেছে চমৎকার ভাবে —

আণবিক অস্ত্রধারী পৃথিবীর দৃপ্ত শাসকেরা
নিত্য নিত্য সানিয়ে তুলছে বোমা
নাপাম ফেলছে ভিয়েতনামে, খেলছে দাবা
মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, এশিয়ার দারিদ্র্য নিয়ত।
কতিপয় ধড়িবাজ পৃথিবীকে করেছে ভাগাড়
প্রেমহীন নিরুত্তাপ ক্রুর লোভাতুর হাতে
ঠেলে দিচ্ছে অনিবার্য স্রোতে
(কবি, প্রতনু প্রত্যাশা)

শুধু বহির্বিশ্ব নয়, স্বদেশচেতনার সূত্রে এই পর্বের কবিতায় উঠে এসেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র :

ছুটে যাই, খবর লিখি, ছবি তুলি, কিন্তু
বাংলাদেশের মত কোথাও এমন দেখিনি।
সহস্র সমস্র শিশু যুবা বৃদ্ধা নারীর শব
দুর্গত দ্বীপাঞ্চল জুড়ে
ঝাঁক ঝাঁক মৃত মাছির মত পড়ে আছে,
নগ্ন, বস্ত্রহীন।
(জনৈক বিদেশী পর্যটক বলছেন, প্রতনু প্রত্যাশা)

ব্যক্তিগত প্রেমও হয়ে ওঠে স্বদেশ-চেতনার সমস্পর্শী : 'আমার কবিতা সে তো তোমার প্রণয়।' 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় পাওয়া যায় এই বোধের আরো প্রগাঢ় উচ্চারণ :

আমি কোন্ শহীদের স্মরণে লিখব ?
বায়ান্ন, বাষট্টি, ঊনসত্তর, একাত্তর,
বাঙলার লক্ষ-লক্ষ আসাদ মতিউর আজ
বুকের শোণিতে উর্বর করেছে এই
প্রগাঢ় শ্যামল।

সমকালীন পরিপার্শ্বের তাপ ও জ্বালা যেমন তার কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি তাতে যন্ত্রণা মোচনের স্নিগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে ভাষাভঙ্গির সার্থক ব্যবহারে। শব্দের যথোপযুক্ত ব্যবহার, ছন্দের নিয়মানুবর্তী দোলা, আধুনিক জীবনের স্বেদ ও সংঘাতের উপযোগী তাঁর কবিতার ভাষা।

ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত একটি চমৎকার কবিতা :

লাল গোলাপটা তোমাকে মানায় বেশ,
অথবা তুমিই গোলাপের লাল কুঁড়ি,
এ তিন ভুবনে নেই কোন তোমার জুড়ি
বিদ্যুতে মেঘে অর্পিত তনু কেশ –
(রূপম, দুর্লভ দিন)

"তিনি ছন্দ সম্পর্কে সচেতন। হৃদয়ের তুলনায় কান তাঁর বেশি সতর্ক। ... তবে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জাগতিক বিষয়সমূহ এমন কি বহমান জাগতিক সমস্যাসমূহ নিয়েও কাচ্যচর্চা করেছেন। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা ছড়াধর্মী হয়ে উঠেছে।"[৩৭]

দিলওয়ার সমাজ-সচেতন ও সমাজ-বাস্তবতার কবি। তাঁর কবিতার মৌল প্রেরণা হলো হৃদয়নির্ভর, রোমান্টিকতা এবং সংগ্রামী চেতনা। সমকালীন জীবনের বাস্তব

৩৭. বশীর আল হেলাল, *সাম্প্রতিক কবি ও কবিতা,* পৃ. ৪৬

অভিজ্ঞতা যেমন তাকে কবিতা রচনায় আমন্ত্রণ জানায়, তেমনি সংগ্রামী চেতনায় নির্ভর করে গড়ে ওঠে তাঁর শব্দভাণ্ডার। সমালোচক বশীর আল হেলাল বলেন, "দিলওয়ার তাঁর সব দুঃখ, ক্রোধ, জীবন-যন্ত্রণা, জীবনোল্লাসে বাস্তবচেতনা ও আদর্শ বোধকে তাঁর সৌন্দর্য চেতনা ও একটি রোমান্টিক হৃদয় দ্বারা মণ্ডিত করেছেন, সেই জন্যে তিনি সার্থক কবি।"[৩৮] গণমানুষের স্বপ্ন-সাধের কাছে নিবেদিত তাঁর কবিতার উচ্চারণ :

যাদের চোখের মনি জ্বলে ওঠে
রাত পোহাবার আগে
পৌছিয়ে দিতে পৃথিবীর কথা
সূর্যের পুরোভাগে
শ্রমজীবী সেই মহামানবের
রক্তগোলাপ হাতে
ছড়িয়ে দিলাম আমার কবিতা
নিদ্রাবিহীন রাতে।

শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তাঁর এই সহমর্মিতা, এই জীবনবাদ স্বদেশের কাল-চেতনায় সম্পৃক্ত হয়ে তাঁর কবিতাকে পৌছে দেয় আন্তর্জাতিকতায় —

ধারালো বর্শার মতো স্বর্ণময় সূর্যরশ্মি ফলা
কীন ব্রীজে আঘাত হানে শুরু হয় জনতার চলা।

বাহান্ন থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত বাঙালি জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন, স্বপ্ন-সংঘাত ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল। দিলওয়ার এই সময়ের সংঘাতকে ধারণ করেই দেশ, মাটি, আর দেশের মানুষকে উপজীব্য করেছেন তাঁর কবিতায়। তবে "রূপকল্প ও আঙ্গিকরীতিতে রাবীন্দ্রিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রভাব চিহ্নিত, তবে সে প্রভাব প্রায়শ কতকগুলি শব্দব্যবহারেই সীমিত, মূল ভাবধারা রবীন্দ্রযুগ থেকে তেমন প্রাগ্রসর নয়।"[৩৯] তবে পরবর্তী কাব্য সংকলনে দিলওয়ার মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
৩৯. রাহাত খান, *মাসিক পূবালী*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭২, পৃ. ৯১৯

ও ফ্রি ভার্সের ব্যবহারে সফলতা অর্জন করেছেন। এছাড়া সনেটেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'উদ্ভিন্ন উল্লাস' কাব্যগ্রন্থে সনেটের আঙ্গিক সচেতনতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের ব্যবহার সূত্রে সংগ্রামী মানুষের শক্তি ও মুক্তির জয়কে তিনি উচ্চকিত করে তোলেন প্রগাঢ় উচ্চারণে :

অলৌকিক রোগাক্রান্ত শ্যেন তুই অন্ধ ইডিপাস
ডাকে তোরে মুক্তিদাতা বিপ্লবী মাটির স্পার্টাকাস।

শহীদ কাদরীকে পঞ্চাশের দশকের সবচেয়ে মেধাবী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অনেকেই। তাঁর কবিতার তীক্ষ্ম নাগরিকতা, নির্মেদ প্রকরণ এবং মননির্ভরতা তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। নাগরিক জীবনের নানাবিধ অনুষঙ্গ ও অভিজ্ঞতাকে তিনি রূপায়িত করেছেন যেখানে নাগরিক অমানবিকতার কেন্দ্রে ব্যক্তি মানুষের নিরন্তর পদযাত্রা — রৌদ্রে, বর্ষায়, ক্ষুধা ও স্বপ্নের ভেতর :

এক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু বর্ষার বিদ্যুতে
নগ্ন পায়ে ছেঁড়া পাতলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকেঝকে সদ্য নতুন নৌকার মতো একমাত্র আমি।
(বৃষ্টি, বৃষ্টি : উত্তরাধিকার)

আশৈশব শহরে বেড়ে-ওঠা শহীদ কাদরী শহরের অবক্ষয়ী অনুষঙ্গকে যেমন প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনি নাগরিকতার প্রভাবেই তিনি নিসর্গ, মানুষ এমন কি নারীর মধ্যে লক্ষ্য করেন তাঁর বিরোধী কবিসত্তাকে। ফলে "নগর জীবনের সন্ত্রাস, ক্লেদ ও পতন শহীদ কাদরীর প্রথম গ্রন্থ 'উত্তরাধিকার'-এ এতটা মহামহিম যে, এই গ্রন্থের সব কবিতাকে একজন নিশাচর নগর-পথিকের দিনলিপির বিস্তারণ ভাবা যায়।"[৪০] তাঁর নগরচিত্র আবশ্যিকভাবেই নৈশচিত্র — "ঝুলে থাকে মাঝ রাতে রেস্তোরাঁর কড়িকাঠ থেকে/বাদুড় না বেলুন বন্ধু, স্বপ্ন না হতাশায় ঠাসা?" নাম-কবিতার এই অন্ধকারবোধ সারা কাব্যে লেপ্টে রয়েছে :

---

৪০. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা*, পৃ. ৩৪

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ণ থেকে নেমে —
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নিচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক আউটে আঁধারে।

নাগরিক জীবনে কবি যে আত্মসংকটের মুখোমুখি, বিপদাপন্ন অবস্থার শিকার, তারই সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এখানে। তাঁর অধিকাংশ কবিতার উপজীব্য বিষয়সমূহে স্বদেশ-সংলগ্ন থেকেও যেন তিনি নিজেকে ভেবেছেন 'নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু, অনাত্মীয় একক/আঁধার টানেলে যেন ভূতলবাসী'র মতো। ব্যর্থতার বোধই জীবনের সবটুকু নয়, জীবনের অপর প্রান্তে জেগে ওঠে স্বপ্ন। যে স্বপ্ন তাঁর রাজনীতি-চেতনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে ওঠে :

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ
আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো
দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা
জ্বলজ্বলে রূপ জ্যোৎস্নায়।
(ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়, তো. অ. প্রি.)

অথবা,

যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ রক্তপাতে, আর্তনাদে
হঠাৎ হত্যায় ভরে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
অথচ সেই প্রান্তরেই একদা ধাবমান জেব্রার মতো
জীবনানন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বাতাস রয়েছে।

এছাড়াও 'রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট, নিষিদ্ধ জার্নাল থেকে, রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন, স্বাধীনতার শহর, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বদেশদীপক উচ্চারণ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এক্ষেত্রে আঙ্গিক-সচেতনার পরিচয় পাই তাঁর ছয় মাত্রায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে :

বন্য শূকর খুঁজে পাবে প্রিয় কাদা
মাছ রাঙা পাবে অন্বেষণের মাছ
কালো রাতগুলো বৃষ্টিতে হবে শাদা
ঘন জঙ্গলে ময়ুর দেখাবে নাচ।
(সংগতি)

সার্থক উপমার ব্যবহারও লক্ষণীয় :

১. হে আমার শব্দমালা, তুমি কি এখনও বৃষ্টি-ভেজা বিব্রত কাকের মতো
২. চারিদিকে বিপ্লবীর চোখের মতন উদ্ধত আগুন-রঙা ফুল গাছে গাছে
৩. শিউলি গাছের মতো আমার মা দারুণ সুগন্ধ
সঙ্গে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে টান দেন কনিষ্ঠ আঙুলে।

উপমা, প্রতি-উপমা কবিতাকে করে গতিবান, ইন্দ্রিয়ঘন ও চিত্রল। শহীদ কাদরী উপমা ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব ভুবন যেমন তৈরি করেছেন তেমনি বিষয়বস্তুর মহিমাকে ছন্দের শাসনে বেঁধেও তাকে দিয়েছেন অতুলনীয় গৌরব। এখানেই তিনি সকলের চেয়ে আলাদা।

আমাদের আলোচ্য পর্বে ষাটের দশকের কবি রফিক আজাদের কবিতা গ্রন্থভুক্ত না হলেও এই সময় পূর্বে প্রকাশিত তাঁর কবিতায় তৎকালীন সামরিক শাসকের বুটের তলায় নিষ্পিষ্ট জনগণের যে অসহায় আর্তি প্রতিফলিত হয়েছে — তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। শহীদ কাদরীর মতো রফিক আজাদও আত্মসংকটে, অবক্ষয়ে বিব্রত। কিন্তু শহীদ যেখানে নগর ও পরিপার্শ্বের বাইরে নিজেকে অন্য মানুষের প্রত্যাখ্যান, ভালোবাসা, মৃত্যু চেতনায় ধাবিত পাতালে আমূল নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বোপরি স্বাদেশিক বোধে উজ্জীবিত —

নগর বিধ্বস্ত হলে, ভেঙে গেলে শেষতম ঘড়ি
উলঙ্গ ও মৃতদের সুখে শুধু ঈর্ষা করা চলে।
জাহাজ, জাহাজ — ব'লে আর্তনাদ সকলেই করি
তবুও জাহাজ কোনো ভাসবে না এই পচাজলে।
(নগর ধ্বংসের আগে, অসম্ভবের পায়ে)

লক্ষণীয় 'জাহাজ' এবং 'পচাজল' প্রতীকধর্মী এই শব্দ দু'টি সবিশেষ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 'জাহাজ' ভালবাসার জন্য সমুদ্র না হলেও দুকূলপ্লাবী জলস্রোতের প্রয়োজন। সেই বিকশিত সমাজেই এই জলস্রোত বহমান যেখানে অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিল্পসাহিত্যের চর্চা তথা সৌন্দর্যের অন্বেষা বর্তমান। অথচ কবিতাধৃত 'পচাজল'-এর প্রতীকে সেই উত্তাল সময়ের প্রেক্ষিতে প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে যখন সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের আমলের 'কালো দশকে'র ডোবায় আবদ্ধ মানুষের মন ও মনন। বলাবাহুল্য, স্বৈর-শাসকের পচা জলাশয়ে শিল্পের 'জাহাজ' কখনো ভাসতে পারে না। তৎকালীন এই বিবর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতটি উঠে আসে এই কবির শব্দ ব্যবহারেও —

যেন একলক্ষ দু'জাহার তিনশ চারজন রফিক আজাদ
সামরিক কায়দায় প্রতিবন্ধকহীন পাতালে নেমে যাচ্ছে।

কেবল স্বদেশের মাটিতেই নয়, বিশ্বজুড়ে হানাহানি, যুদ্ধ রক্তপাত এবং বিপর্যয়ে বীতশ্রদ্ধ কবি অবশেষে রচনা করেন 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' নামক যুদ্ধবিরোধী কবিতা। শান্তির পক্ষে দৃঢ়তায় দাঁড়ানোর আহবান ধ্বনিত হতে থাকে এই উচ্চারণে :

চুনিয় শুশ্রূষা জানে,
চুনিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধে, চুনিয়া সান্ত্বনা শুধু
চুনিয়া কখনো জানি কারুকেই আঘাত করে না ;
চুনিয়া সবুজ খুব, শান্তিপ্রিয় শান্তি ভালোবাসে
কাঠুরের প্রতি তাই স্পষ্টতই তীব্র ঘৃণা হানে
চুনিয়া গুলির শব্দ পছন্দ করে না।

'অকর্মক ক্রিয়ার উক্তি' কবিতাটিতে ষাটের দশকের সেই নারকীয় অনুভূতি, অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকার ভাষারূপ পেয়েছে ভিন্নধর্মী প্রতীকের মাধ্যমে :

অকর্মক ক্রিয়া আমি — পঙ্গু, হীন ; সাহায্য ব্যতীত
চলাফেরা, এমনকি, বসে থাকা দেখি বেগতিক

... বাষ্পাতুর নেত্রে সম্মুখে তাকিয়ে দেখি :
অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, চতুর্দিকে আঁধার, আঁধার —
আমার মুক্তির কোনো আশা নেই, সম্ভাবনা নেই।
(অকর্মক ক্রিয়ার উক্তি)

প্রায় সমার্থক দু'টি শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে নতুনতর নান্দনিক মাত্রা প্রয়োগ করেন তিনি তা তাঁর প্রকরণগত নিরীক্ষারই ফসল হয়ে ওঠে —

'পদব্রজ' আর 'পায়ে-হাঁটা' এই শব্দবন্ধ দু'টি নিয়ে
আমার হয়েছে মুশকিল
একটি আমাকে টানে ভেতর থেকে,
অপরটির টান বাইরের হলেও
খুউব জোরালো —

ছন্দ ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত সচেতন। নিরেট গদ্যাত্মক কবিতায়ও তাঁর অক্ষরবৃত্তের বুনোট অবধারিত হয়ে ওঠে। এছাড়া মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনায়াস লব্ধ ভঙ্গিটি প্রয়োগ করে তিনি জন্ম দিয়েছেন অনেক জনপ্রিয় কবিতা। রফিক আজাদের অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার সম্পর্কে খোন্দকার আশরাফ হোসেন বলেন, "অক্ষরবৃত্তীয় ছন্দ কাঠামোতে তৎসম শব্দ কখনো কখনো যুক্তাক্ষর শব্দের ব্যবহারে কবিতার গতিময়তা ক্ষুণ্ন হয়েছে।"[৪১] এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে রফিক আজাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ : "যে সময় আমরা কাব্যচর্চা শুরু করি, সেই প্রারম্ভিক যাত্রাপথে যখন ভাষার উপর উপর্যুপরি হামলা চলে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে, অনাবশ্যকভাবে, অভিধাননির্ভর আবরি-উর্দু শব্দ ভাণ্ডার এসে কাব্যের বাজার দখল করতে থাকে - তখন অত্যন্ত সচেতনভাবে কবিতায় আমি তৎসম, অর্ধতৎসম শব্দ, এমনকি অনেক ভারি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে হাজার বছরের বাঙলা ভাষার ঐতিহ্যে সংলগ্ন থেকেছি। বিশ্ব-কবিতার যে প্রধান প্রবণতা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এই প্রসঙ্গে আমি তা-ও স্মরণে

---

৪১. *বাঙলাদেশের কবিতা, অন্তরঙ্গ অবলোকন*, পৃ. ৮২

রেখেছি। আধুনিক কবিতায় শুধু নয়, আধুনিক জীবনেও নিরেট গীতিময়তার কোনো স্থান নেই। কাজেই গীতিময়তাকে অপরিহার্য করে তোলে এরকম শব্দ আমি সচেতনভাবে পরিহার করে থাকি।"[৪২]

রফিক আজাদ স্বেচ্ছাকৃত তৎসম ভারি শব্দের সঙ্গে চলতি ভাষার হালকা শব্দাবলির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে 'চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া' থেকে 'ক্রমাগত দৈনন্দিন' শব্দ এবং সরল বাক্যবন্ধের দিকেই ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়। কবিতায় তাঁর এই শব্দানুভাবনা কবিতার বিষয় হিসেবে উপজীব্য হয়ে ওঠে। নারীকে তাঁর মনে হয় মূর্তিমান অভিধান, খুচরা অথবা খুব দরকারি ভারি শব্দাবলি প্রয়োজনে পড়ে নেন নারীর শরীরে : 'তোমাকে পড়েই শিখে নিই শব্দের সঠিক অর্থ, মূল ধাতু, নির্ভুল বানান।' আঙ্গিক প্রকরণের মতো পরবর্তী সময়ে তাঁর কাব্য-বিষয়েও বৈচিত্র্য বেড়েছে, সমকালীন রাজনীতি সংলগ্ন হয়ে উঠেছেন অনেক বেশি।

আবদুল মান্নান সৈয়দ ষাটের দশকের অন্যতম শিল্প-সচেতন কবি। প্রথম থেকেই তিনি কবিতাকে নিয়েছেন বোধের বিম্বিত দর্পণ হিসেবে, বহির্পৃথিবীর জানালা হিসেবে নয়। যদিও বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় লক্ষ্য করা যায়, কবির অন্তর্জগতের চেয়ে কবিতায় তাঁর সামাজিক সত্তাই প্রবলতর। মান্নান সৈয়দের কবিতায় অন্তর্জগৎই প্রধান, বহির্পৃথিবী নিজ গৌরবে নয়, বরং তাঁর প্রিজমের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। এই শ্রেণীর কবিতায় শুধু তির্যকতাই মূল সুর নয়, নিমগ্নতা, বেদনার অভিঘাত এবং সমাজ বাস্তবতার ছায়াপাতও লক্ষ্যযোগ্য। "বস্তুত কবির অন্তঃদেশে সামাজিক বিস্ময় ও অস্থিরমতি মানুষের যে হাহাকার, মূঢ়তা, স্বার্থ-প্রয়াস, স্থূল বিবেচনা কূটাভাস আবিষ্কৃত তাই তিনি কবিতায় প্রতীয়মান করেছেন, কখনো বিনম্র মেজাজে, সংহত উচ্চারণে আবার কখনো এক ধরনের বর্ণোজ্জ্বল সাংকেতিক স্বরধ্বনি ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়ঘন চিত্রকল্প ও বাকপ্রতিমার নির্মাণ ও প্রতিনির্মাণের মাধ্যমে তিনি কবিতা বাস্তবতাকে অনুবাদ করে নিঃসন্দেহে তাঁর দ্রোহকে কুশাগ্রসম সূক্ষ্ম ও সঞ্জীবিত করেছেন।"[৪৩] তাঁর বাস্তবতাবোধ সংক্রামিত কবিতা ভাষারূপ পেয়েছে এভাবে :

> আমাকেও তেল-নুন-মাংসের হিসাব কষতে হয়
>
> আমি নই বায়ুভুক রবীন্দ্রনাথ,

---

৪২ রফিক আজাদ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

৪৩ . আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সাহিত্য*, সেলিমা স্বপ্না সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩, পৃ.২২

কবিতাকেও হতে হয় পৌরুষের —
শুধু নারীলাবণিগ্রস্ত নয়
বস্তুর সংঘর্ষে দীপ্ত জ্বলে উঠতে হয় আগুনের মতো।

বস্তুত, চেনা-জানা পৃথিবী বহির্ভূত যে অচেনা অদেখা জগৎ কবির অন্তঃভাবনায় পরিক্রমশীল, তার অতিনির্দিষ্ট আয়তন বা বলয় যেন আধো আলো আধো অন্ধকারে নিমজ্জিত তেমনি তার অস্তিত্ব নিঃশব্দ ও পরাক্রমশীল। ফলে কবিকে হতেই হয় অনুগত দাস, কেননা তাঁর বিস্ময়ের অবধি নেই। একটি টানা গদ্য-গাঁথুনি কবিতায় দেখা যায় :

দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল অনেক অনেক বছর আগে,
ঢাকায়, গোপীবাগে, কয়েকজন গ্রামীণ যুবতী খাল পেরিয়ে
এসেছিলো কুলোয় করে চাল নিতে, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা
করবে নেচে-গেয়ে।
অক্রিয় ঐ সমকামীকে দেখে কেন অনেক দিন আগের তুচ্ছ
ঐ ঘটনাটি মনে পড়ে গেল, জানিনে —
(বৃষ্টিহীন কলকাতা)

মান্নান শব্দ আর ধ্বনির কারিগর। মান্নানের মধ্যে এও একটি স্পর্ধার মতো ব্যাপার। মান্নানের সমকালীনদের মধ্যে শুধু নয়, অন্য দশকেও তাঁর মতো শব্দ-সচেতন কবি নেই। ধ্বনি-চেতনা মান্নানকে এক নিখুঁত কলার সন্ধান দিয়েছে।

ধিতাং কুঠার বাজে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু
আজ সে সর্বতোশূন্য যাকে পুরো চেয়েছি ভিতরে,
ধিতাং কুঠার নাচে, ধ্বংস করো বিশ্বাসের তরু
রক্ত বুকে তীব্র নাদ শ্রাবণের মেঘের মাদলে।[৪৪]

সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহার লক্ষণীয় —

৪৪. আবদুল হাফিজ, *আধুনিক সাহিত্য, বিবেচনাসমূহ*, ১৯৮২, পৃ. ৪৪

চীৎকারের নিচে পড়ে আছে আমাদের শাদা শহর
তার পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা, উরু, জানু —
(অমর কবিতা)

প্রতীক ও চিত্রকল্প ব্যবহারে কবিতাকে তিনি অধিক অর্থদ্যুতি দিয়েছেন এভাবে —

১. কোটরে লুকিয়ে বৃষ্টি দেখি
আমি, দুপুর বারোটা আর তিনটি কবুতর।

২. এই শস্তা হোটেলের টালির উপরে নাচে তিনটি কবুতর।

উপমা ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততা —

১. কবির সারাদিন গেছে কুকুরের মতো ব্যস্ততায়।

২. প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তুমি অন্ধ ট্যাক্সির মতন
জল ছিটিয়ে চলে গেলে ;

পরিশেষে বলা যায়, প্রাকরণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রেখেও আবদুল মান্নান সৈয়দ বাক-বিভূতিতে স্বাদেশিক রীতির অনুসারী।

নির্মলেন্দু গুণ ষাটের দ্বিতীয় প্রজন্মের কবি। যিনি দেশ-চেতনা এবং আত্মগত প্রেমের অনুভবকে যুগপৎ উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়। এই সময়ে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যে বাঙালি জাতিসত্তা — তাঁরই নির্যাস ছেঁকে কবিতায় তুলে আনেন সামাজিক ও রাজনৈতিকবোধের নতুন মাত্রা। সারা দেশ যখন সংগ্রামে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে, গ্রামের মানুষ কবিকে জিজ্ঞেস করে ঢাকার খবর, আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আইয়ুব খান এখন কোথায়?— তখনো নির্মলেন্দু গুণের উচ্চারণ দ্বিধাগ্রস্ত :

আমি কিছুই বলবো না, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা
সারি সারি চোখের ভিতরে
বাঙলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে দেখবো।
উৎকণ্ঠিত চোখে নামবে কালো অন্ধকার,

আমি চিৎকার করে কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার
জ্বালা মুছে নিয়ে বলবো
এ সবের কিছুই জানি না,
আমি এসবের কিছুই বুঝি না।

যদিও আমাদের আলোচ্য পর্বে গুণের প্রথম গ্রন্থটি মাত্রই প্রকাশিত হয়েছে। সমকালীন স্বদেশ, স্বদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বৈষম্য, শোষণ-শাসন, জীবনের ব্যর্থতা, পরাজয় প্রভৃতি এ কাব্যের উপজীব্য হলেও এই পর্বে গুণের প্রেমিক সত্তাও মুখর হয়ে উঠেছে। রাজনীতির মুখর বাচনভঙ্গি আয়ত্ত করলেও তিনি রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক কবিতা খুব বেশি লেখেননি। রাজনীতি উপলক্ষ মাত্র, প্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার আর্তিই প্রবল হয়ে ওঠে —

তুমি বললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে —
আমরা ভীষণ দুঃখী, নিপীড়িত শত অত্যাচারে
'গীতাঞ্জলি' অকর্মণ্য হবে।
আমরা তাই রঙিন প্ল্যাকার্ড
সাজিয়েছি মাও-সে-তুং, গোর্কি, নজরুল।
তুমি বললে প্রেম হবে প্রেমের ভুবন যদি আসে
বুকের কুসুম থেকে দেবে শব্দাবলি।
কবিতার বিমূর্ত চন্দন আমি তাই
যে কোনো কঠিন মূল্যে প্রেমের ভুবনখানি চাই।
(জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ)

মনোহরণের স্বভাবদক্ষতার সঙ্গে রোমান্টিক আবেগময়তাকে মিলিয়ে তিনি একটি হার্দ্য কবিতাভঙ্গি তৈরি করেন যার সঙ্গে স্বভাবকবির মিল রয়েছে। বস্তুত, গুণ স্বয়ং 'নির্বাচিতা'র মুখবন্ধে সরল স্বীকারোক্তিতে অপরাঙ্মুখ : "আমার যা বলবার, স্পষ্ট করেই আমি তা বলবার চেষ্টা করি ; যা কঠিন আমার মন তাতে সহজে সাড়া দেয় না। সহজ করে পাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। চারপাশের কঠিনের ভিড়ে আমি

চাই সহজ করে বলতে। জানি এ স্বভাব নাগরিক কবির নয়, লোককবির। ময়মনসিংহ গীতিকার কবিদের মধ্যে আমার জন্ম।"[৪৫] লোককবির হৃদস্পন্দন গুণের কবিতার বৈশিষ্ট্য হলেও পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যুক্তে হয়েছে তাঁর দীপ্ত সংগ্রামশীলতা। "তাঁর কবিতা রঙিন চটকদার আবেগে চিত্রিত, কিন্তু শৈল্পিক চাতুর্যের গহীন সুতোর এমব্রয়ডারির সাজ সেখানে দুর্লক্ষ্য। কাব্যভাষায় কোনো রকম নতুনত্ব তিনি সৃষ্টি করেননি ; বস্তুত পঞ্চাশ, ষাটের চলতি প্রকাশভঙ্গির সাথে মুখরতার বাকবিভূতি মিশিয়ে তৈরি হয় তাঁর কবিতার আকর্ষণ। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার ভেতর–বাহির বলে কিছু নেই ; পুরোটাই বৈঠকখানা, সবটুকু প্রথম দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান ও বোধ্য। অবচেতনের কারবারি নন গুণ, ধরা অধরার রৌদ্র–ছায়ার জগৎ সৃষ্টি করেন না তিনি ; তাঁর কবিতা কোনো বোধ নির্মাণ করে না শেষ পর্যন্ত।"[৪৬]

বলা বাহুল্য, ধরা–অধরার রৌদ্র–ছায়ার জগৎ সৃষ্টি না করেও যারা কবি – নির্মলেন্দু গুণ সেই দলের অন্যতম কবি। কবিতায় সহজবোধ্যতার যে আবেদন, তাঁর প্রেমিকসত্তায় বৈচিত্র্যময় যে রূপায়ণ, সংস্কারমুক্ত জীবন–ভাবনার নানাদিক–সর্বোপরি রাজনৈতিক–সামাজিক–ঘটনা–সংঘটনের প্রতি তাঁর যে আন্তরিকতা তারই প্রতিফলনে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর কবিতাবলি।

নির্মলেন্দু গুণের সমসাময়িক কবি মহাদেব সাহা, আবুল হাসান এবং হুমায়ুন কবিরের কবিতা আলোচ্য পর্বে গ্রন্থিত না হলেও এই ত্রয়ীর কবিসত্তার বৈশষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত হয়ে ওঠে এই সময় পর্বেই। আত্ম–সংকটে জর্জরিত হয়েও সমকালীন পরিবেশ, নিসর্গ, দেশভাগ, স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় মহাদেব সাহার কবিতায় উপজীব্য হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি আবুল হাসানের কবিতা অবক্ষয় এবং জীবনাসক্তির টানাপোড়েনে তীব্র রক্তিম। সমকালের সংকট, বৈরী পরিপার্শ্ব, ব্যক্তিগত সংকট এই কবিকে গ্রাস করলেও জন্মভূমি ও জনতার সঙ্গে সংলগ্ন থাকবার আর্তি প্রতিফলিত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায় —

> গোলাপ ফুটছে তাও রাজনীতি, গোলাপ ঝরছে তাও রাজনীতি
> মানুষ জন্মাচ্ছে তাও রাজনীতি, মানুষ মরছে তাও রাজনীতি।

---

৪৫. নির্মলেন্দু গুণ, *নির্বাচিতা*, মুখবন্ধ, পৃ.

৪৬. খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা*, পৃ. ১৩৩

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ গভীরভাবে প্রতীকায়িত হয়ে ওঠে হুমায়ুন কবিরের কবিতায়। দেশকালগত সংকটে গভীরভাবে বিপর্যস্ত এই কবি চেয়েছেন বিপর্যয়ের সঙ্গে বিমুগ্ধতার সমন্বয় ; 'কুসুমের সঙ্গে ইস্পাতের মিলন'। সংগ্রামকে সৌন্দর্যে এবং সুন্দরকে সংঘাতে পরিণত করে তুলেছেন তিনি। সমকালীন সমাজ, জীবন-যাপনের প্রায় সকল অনুষঙ্গেই লক্ষ্য করা যাবে সুন্দর ও সংঘাতের এই সমন্বয়।

ফুলের আড়াল থেকে মানুষের বন্দুক
জনসমাগমকে ভাই ডেকে গর্জে ওঠে।

উপসংহারে বলা যায় এই পর্বের কবিতায় বিষয়ের যেমন বৈচিত্র্য লক্ষণীয় তেমনি ভাষা হয়ে উঠেছে অধিকতর জীবনসম্পৃক্ত ও প্রত্যক্ষধর্মী। দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দ মুখের ভাষা বা বাকভঙ্গিকে গ্রহণ করে এই পর্বের কবিকুল বিষয়বস্তুতে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নিরাভরণ সৌন্দর্য। ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্ত বা গদ্যছন্দ ব্যবহৃত হওয়ায় তাঁদের কবিতা হয়ে উঠেছে আরো স্পর্শগ্রাহ্য, বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী।

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে বাংলাদেশের কবিতায় যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা সমাজ-মানসেরই প্রতিফলন। তবে বিষয়ই একমাত্র কথা নয়। শিল্পের পূর্ণতা বিষয় ও আঙ্গিকের হর-গৌরী-মিলনেই সম্পন্ন হয়। তাছাড়া আঙ্গিক কোনো নিরপেক্ষ ব্যাপারও নয়। এমনও নয় যে, যে কোনো আঙ্গিকেই যে কোনো বিষয়বস্তুকে পুরে দেয়া যায়। বিষয়বস্তুর চাহিদার প্রয়োজনেই কোনো শিল্পকর্মের আঙ্গিক নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের কবিতায় নতুন দেশ নতুন ভাব-ভাষা এবং নতুন চেতনাবোধের প্রয়োজনে নতুন আঙ্গিকের সন্ধান করে নিয়েছিলে। অর্থাৎ ভাবধর্মের সঙ্গে শৈলী ও প্রকরণ-অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলেই বাংলাদেশের কবিতার প্রকরণেও বহুবিধ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। নতুন কলেবরের জন্য প্রয়োজন নতুন পোশাকের। বিষয় ও আঙ্গিক বিচারে বাংলাদেশের কবিতার এ উত্তরণ আমাদের আশাবাদী করে তোলে।